ফসিল

সুবোধ ঘোষ

নবসাহিত্য নিকেতন
৩২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯৪৮

প্রকাশক—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল
নবসাহিত্য নিকেতন
৩২, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচী

ফসিল

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আট বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এককুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি; তিনি নরপাল, ধর্ম্মপাল এবং অরাতিদমন। দু'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'ত; এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে শুধু ন্যাংটো ক'রে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মত দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ী আর তুরবারির ঘটা; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল।

একজন অমাত্য, আটজন প্রধান আর—ফৌজদার, আমিন, কোতোয়াল, সেরেস্তাদার। ক্ষত্রিয় আর মোগল এই দু'জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন। হিঙের মত সেই অপূর্ব্ব অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজে রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে-আট বর্গমাইল অঞ্জনগড়—শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটীর ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়। কুর্ম্মি আর ভীলেরা দু'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ডগুলি

থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা, যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসীল বিভাগ আর ভীল ও কুর্মি প্রজাদের ভেতর একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্দ্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টীম আছে। হয়শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভুষি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা, যব, জনার চাই-ই।

তসীলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীর্য্যের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। একঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ—বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলেদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্ত্তি হয় সোজা কোন ধাঙড় রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ ক'লকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্মি-প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটীর ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ; সালসার মত সুগন্ধ মাটীতে। তাদের যেন নাড়ীর টানে বেঁধে রেখেছে। বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়—ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্ত্তনে তাদের দিনসন্ধ্যের সমস্ত মুহূর্ত্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুস্থ জমায়েত

হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আল্পনা-আঁকা হাতীর পিঠে চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন—প্রজাদের আশীর্ব্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই আর দুচারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে, আশীর্ব্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয় ; প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন, আদায় উসুল আর তসীল চলছিল বটে কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব টিকিয়ে রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টীমের খরচ! রাজবাড়ীর বাপের-কেলে সিন্দুকের রূপো আর সোনার গাদিতে ক্রমে ক্রমে হাত পড়ল।

অঞ্জনগড়ের এই অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্টের পদে আনানো হল একজন ইংরেজী আইননবীশ। আমাদের মুখার্জ্জীই এল ল-এজেন্ট হয়ে। মুখার্জ্জীর চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জ্জীই হয়ে গেল ডি ফ্যাক্টো অমাত্য, আর অমাত্য রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জ্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলার হিস্ট্রি-পড়া মার্কিণী ডিমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সৎসাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জ্জী তার প্রতিভার প্রতিটা পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের

উন্নতি সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেণ্ট সাহেবকে—একদিকে যেমন কড়া অন্যদিকে তেমনি হমদরদী। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জ্জীর নির্দ্দেশে বন্ধ হল লাঠিবাজি। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করে তুললো। স্টেটের জরীপ হ'ল নতুন করে; সেন্সাস নেওয়া হল। এমন কি মরচে-পড়া কামান দুটোকেও পালিস করে চকচকে করে ফেলা হ'ল।

ল-এজেণ্ট মুখার্জ্জীই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড সম্পদ। রত্নগর্ভ অঞ্জনগড়—তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ। ক'লকাতার মার্চ্চেণ্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রী স্টাইলের প্যালেস। মার্ব্বেল, মোজেয়িক, কংক্রীট আর ভিনিসিয়ান সার্সীর বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্ম্মান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানী আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত্র ধক্ ধক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চ্চেণ্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে—মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্প-বসান ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো, কেয়ারিকরা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্ম্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, শুয়োর বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—ছুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে ; আরো এগার কাঠা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালীয়ান ব্যাণ্ড মাস্টার হ'লেই ভাল।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখার্জ্জী বিভোর হয়ে ভাবে—তার ইরিগেশন স্কীমটার কথা।—উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া-গাঁথুনীর শ্লুস-বসানো বড় বড় ডাম। বরাকরের বর্ষার সমস্ত ঢলটাকে কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মত। প্রত্যেক কুর্ম্মি প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি। আউশ আর আমন ; তা ছাড়া একটা রবি। বছরে এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক ; দক্ষিণেরটায় আখ, যব, আর গম। তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক ; ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটী এস্টিমেটে সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠি খেলা নয় ; এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল—এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব, কভি নেহি। মুখার্জ্জী উঠলো ; দেখা যাক্ বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কি না।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির গোছাটাকে একটা নির্ম্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জ্জীর সামনে এগিয়ে দিল ছুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ!

আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে, তাতে যেন সরকারী হাত না পড়ে। আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয় তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য : কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখছ তো মুখার্জ্জী, শালাদের হিম্মৎ।

—হ্যাঁ, দেখছি।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়ল—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি; দুদিন দুরাত ধরে দেখি।

মুখার্জ্জী মহারাজাকে শান্ত করল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা বসে বসে খাবার মত পয়সা আছে তার। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিষ। ফয়জাবাদ স্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেণের কামরায় তুলে দাও। বাস্—নগদ একটী আনা, হাতে হাতে।

তুলাল বলতো—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় যটা সাদা চুল দেখছ ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে তুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেণ্ট, ছুটী, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সব সেই কুর্ম্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও তুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এস তুলাল। বলতো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দি। তোমার সব কুর্ম্মিদের ভর্ত্তি করে নি।

তুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাততঃ কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক্।

—আচ্ছা তাই হবে। সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দিত।

তুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্ম্মি একত্রিত হ'ল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকাচুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়ীটা খুলে হাতে নিয়ে তুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ কে আমাদের তুসমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোন মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মত তুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ল—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ··· ।

কুর্ম্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল—মাহাতোর জন্য।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে গেল ফিরে।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন মুখাৰ্জ্জীর কিছু জানতে বাকী রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘেই বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জ্জর এই সব নরপালদের তা হ'লে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয় তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক্।

পেয়াদারা এসে মহারাজাকে জানালো—কুর্ম্মিরা রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলেছে—বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখাৰ্জ্জীর। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হ'ল। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো। মেষশিশুর মত ভীরু—দুলাল যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—তুমিই এসব সয়তানী করছ! মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধূলো আমি।

—চুপ থাক।

—জী সরকার।

—চুপ্! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

—ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্ম্মি খনিতে কুলি খাটতে পারবে না।

—জী সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হ'ল মুখার্জীর ওপর।—সিণ্ডিকেটকে এখুনি নোটিশ দাও। যেন আমার বিনা সুপারিশে আমার কোন কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র।—যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেইহেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। তৃতীয়—আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিণ্ডিকেটেরও একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন সর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নশো নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জী? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খালকাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজা আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ফুঁসে ফুঁসে তড়পাচ্ছে।

মুখার্জী সবিনয়ে নিবেদন করল—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জী বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা। সিণ্ডিকেটের দুষ্ট উৎসাহেই কুর্মি সমাজের এত নাচানাচি। এই

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়!

দুলাল মাহাতোর কুঁড়ের কাছে মুখার্জ্জী এসে দাঁড়ালো। শশব্যস্তে দুলাল বেরিয়ে এসে একটা চৌকি এনে মুখার্জ্জীকে বসতে দিল। মাথার পাগড়ীটা খুলে মুখার্জ্জীর পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসলো মাটীর ওপর। মুখার্জ্জী এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে, শেষে বড় অভিমানে ভেঙে পড়ল—একি করছো মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিণ্ডিকেট আজ তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

মুখার্জ্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলল—কসম, এজেণ্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্য আমরা জান দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটা একটু জলদি জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জ্জী দুলালের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়ল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেকদিন। এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোষাক বদলাবার কথা মুখার্জ্জীকে ভুলতে হ'ল আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিণ্ডিকেটের অফিসে।

—দেখুন মিষ্টার গিবসন, রাজা-প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের সুখ সুবিধার জন্য দরবার তো পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিয়েছে।

গিবসন বললো—মিষ্টার মুখার্জ্জী, আমরা মমিমেকার নই, আমাদের

একটা মিশনও আছে। Wronged humanity-র জন্য আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরো লড়বো।

—সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলেছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তাহ'লে কি করে বাঁচে বলুন তো!

ঝোঁকের মাথায় মুখার্জ্জী তার ক্ষোভের আসল কারণটা ব্যক্ত করে ফেললো।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েল্‌থ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন?

—তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন মিষ্টার গিবসন। কুলি ভর্ত্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজাও খুসি হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয় ভাল হবে।

—সরি, মিষ্টার মুখার্জ্জী। গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুরুট ধরালো।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জ্জীর কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে চলে গেল অফিস ছেড়ে।

ম্যাককেনা এসে জিজ্ঞেসা করল—কি ব্যাপার হে গিবসন?

—মুখার্জ্জী, that monkey of an administrator, মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টার্ম্‌ই গ্রাহ্য করিনি।

—ঠিক করেছ। ওর ঐ ইরিগেশন স্কীমটা। খুব সাবধান, fight it at any cost। নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন expansion-এর মুখে।

—কোন চিন্তা নেই। Domesticated মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করবো।

পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বলল—মাহাতো এসে বসে আছে বোধ হয়। দেখি একবার।

অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলল—এই যে দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল ; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দি।

মাহাতোর পিঠ থাবড়ে ম্যাককেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মৎ মাহাতো আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য, সব সময়। ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জ্জী শুধু আকাশপাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মত সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলোর মাথার ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিম্বা সেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান ; খাস কামরায়।

অমাত্য ও ফৌজদার শুষ্ক মুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের চারদিকে পায়চারী করছেন ছটফট করে। মুখার্জ্জী ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুদ্গার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার ওপর আর স্টেট চালিও।

হতভম্ব মুখার্জ্জী অমাত্যের দিকে তাকালো। অমাত্য তার হাতে তুলে দিল এক চিঠি। পলিটিক্যাল এজেণ্টের নোট।—স্টেটের ইণ্টার্ণাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করেই বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্যি কথা। আমি সব জানি মুখার্জ্জী। আমি অন্ধ নই।

—সব জানি? এ কি বলছেন সরকার?

—থাম সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধূলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে! কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের ওপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যজন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। অমাত্য, ফৌজদার আর মুখার্জ্জী ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জৎ বাঁচান।

অমাত্য বলল—তাই হোক্, কুর্ম্মিদের আপনি সায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল স্যুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জ্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জ্জী এরি মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজার চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দ্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবত শশক হলেও মুখার্জ্জী আন্দাজ করে নিল। সত্যিই তো, এ দিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি! তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা

জানালো।—আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না, মুখার্জ্জী কি যে বল! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জ্জী।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জ্জীর হাত পায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকেল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আণ্ডার-নেক হিট্ চালায়। কড় কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের স্রোতে ভিজে ঢোল হয়ে যায় কালো ওয়েলারের গলার ম্যাটিংগল আর পায়ের ফ্ল্যানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে চার্জ্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও সে বিশ্রাম করার নাম করে না। কাণ্ট্যারে কাণ্ট্যারে সারা পোলো লনটাকে বিদ্যুদ্বেগে পাক দিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভরে যেন স্পীড পান করে নেয়।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ করেন।—বড় রাফ্ খেলা খেলছ মুখার্জ্জী।

সেদিনও সন্ধ্যের আগে নিয়মিত সূর্য্যাস্ত হল অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উদ্যোগ করছেন।

পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুর্ম্মি কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ! মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। এইবার ত্তসমন মুঠোর মধ্যে, নির্দ্দয়ের মত পিষে ফেলতে হবে এইবার। শীগগির ডাক অমাত্যকে।

অমাত্য এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন—দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

—বিনা টিকিটে কুর্ম্মিরা লকড়ি কাটছিল। ফরেস্ট রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্ম্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তারপর?—মহারাজার চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভাল ছিল। তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাস এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিকাল এজেন্টের নোট্‌টা চকচকে সূচীমুখ বর্শার ফলার মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

—অন্ততঃ সিণ্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে।—অমাত্য উত্তর দিল।

মুখার্জ্জীকে ডাকালেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার মুখার্জ্জী। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্ দেখাও; একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জ্জী বলল—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটকান।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কী লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল দুলালের ঘরের দিকে।

মুখার্জ্জী বলল—আমার শরীর ভাল নয় সরকার; কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই।

চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। মার্চ্চেণ্টরা দস্তরমত ঘাবড়ে গেল। তৃতীয় সীমের ছাদটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধূলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্ত্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে—বুম্ বুম্ বুম্। কোয়ার্টসের পিলারগুলো চাপের চোটে তুবড়ির মত ধূলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরি মধ্যে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে পীটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ পথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।—কাজে যাও সব, কিছু হয় নি। কেউ ঘায়েল হয় নি, মরেও নি কেউ।

মার্চ্চেণ্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলল—মাটি দিয়ে ভরাট করবার উপায় নেই, এখনো দু'দিন ধরে ধসবে। হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ।

ম্যাককেনা বলল—তাতে আর কি লাভ হবে? দি মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব। তা ছাড়া, দ্যাট মাহাতো; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই মেট্রোপলিটান কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারী কমিটি; একটা গান্ধিয়াইট বদমাসও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার?

সে রাতে ক্লাব ঘরে আর আলো জ্বললো না। একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়লো মুখার্জ্জীর।

অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! মহারাজা, অমাত্য আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মুর আর প্যাটার্সন। সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেণ্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জ্জীকে অভ্যর্থনা করলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জ্জী। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্লাম্‌জি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার তাই মুখার্জ্জীর কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জ্জী শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে রইল বসে।

গিবসন মুখার্জ্জীর পিঠ ঠুকে একবার বলল—Be strong Mukherjee, it is administration।

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পীটের কাছে মোটরগাড়ী আর মানুষের একটা জনতা। ফৌজদারের গাড়ীর ভেতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাসটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাস এল আরো। ক্ষুধার্ত্ত পীটটার মুখে শবদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিলে একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জ্জীর চোখ দুটো। গাড়ীর বাম্পারের ওপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ

নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

—লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্দ্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল আর ছেনি হাতুড়ি গাঁইতা—কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত অস্ত্রশস্ত্র; যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্য্যয়ে কোয়ার্টস্ আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!

যাযাবর

দূর বুদ্ধগয়ার মন্দিরটা উত্তরের দিগ্‌বলয়ে জ্যামিতিক আঁচড়ের মত দাগা। সেখান থেকে জঙ্গলের বুকে বুকে একটানা গড়িয়ে সড়কটা এখানে এসে পশ্চিমে মোড় ফিরেছে। প্রথমে পরিখার মত আখ আর তিল ক্ষেতের প্রসার; তারপর সহরতলির মেটে বাড়ি—তারপর খাস সহর। মোড়ের কাছে এসে উদ্ভিদরাজ্য তার সীমা হারিয়েছে; শেষ হয়েছে তার বন্যগৌরব। এখানে আরম্ভ—পুকুর, বাগান, চষাক্ষেত; মানুষের গৃহস্থালি—জনতার নমুনা।

মোড়ের দুপাশে ছড়ানো কয়েকটা দোকান আর বাংলো বাড়ি; মাঝে মাঝে শুধু ঘাসফুলে ছাওয়া মেঠো জমির টুকরো টুকরো ব্যবধান। কাছেই পাহাড়ের পায়ের কাছে পল্টনের ছাউনির মত একটা বস্তি। সবই রাজেনবাবুদের জমিদারি। তাঁরা থাকেন সিমলায়।

আমাদের বাড়ির দুপাশে দুটো বাড়ি। পূবের বাড়িটা ছোট, ন টাকা ভাড়া। আগে গালার গুদাম ছিল। পশ্চিমের বাড়িটা বড়, ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। আগে ত্রিহুতের এক জমিদারের পোষা বাইজী থাকত। প্রায় সব বাড়ি কটাই খালি পড়ে আছে।

সন্ধ্যায় একটি আলোও জ্বলে না। ফাঁকা বাড়িগুলো সমাধির মত ঝিমোয়। বড় নির্জ্জন। এ নির্জ্জনতার চাপ ভিড়ের চেয়েও কঠোর; হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ দেড় মাসের মধ্যে একবারও হাসি নি।

মাঝে মাঝে শুধু দূরাগত মোটরবাসের উচ্ছ্বসিত বিলাপ জঙ্গলের লতাগুল্মে গুমরে ওঠে। টেলিগ্রাফের তারগুলো শিউরে বাজতে থাকে। ভরসা হয় এইবার বুঝি কোন প্রতিবেশী আসছেন।

বই পড়া বন্ধ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট বাড়িটার দিকে তাকালাম। কারা যেন এসেছে।

পিলপিল করে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এসে জামতলায় দড়িবাঁধা ছাগলটাকে ঘিরে দাঁড়াল। সবকটিরই আদুড় গা, লাল সালুর এক একটা হাফপ্যান্ট পরানো। ছয় থেকে এক বছর বয়সের ছটি হৃষ্টপুষ্ট ফরসা ফরসা মানুষ।

কারা এরা ? কোন্ ধৃতরাষ্ট্র আবার এলেন আমার প্রতিবেশী হয়ে ? কৌতূহল হল।

সাইকেল থেকে নামলেন নরেনবাবু ওভারসিয়ার, সবে ডিউটি থেকে ফিরছেন। সোলার হ্যাট মাথায়, পরিধানে ঢিলে হাফপ্যান্ট, পায়ে গরম হোস আর বুট, বিবর্ণ আলপাকার গলাবন্ধ কোট ; তাতে বড় থলির মত দুটো পকেট—ফুটরুল, ফিতে, ডায়েরি আর কাগজপত্রে বোঝাই। কাঁধে বলরামের লাঙ্গলের মত একটি থিয়ডোলাইট ঝোলানো !

নরেনবাবু বললেন—আসুন ভাই আমাদের বাড়িতে। ধড়াচূড়ো ছেড়ে আলাপটা সেরে নিই।

নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা সামনে এসে দাঁড়াল—মণ্টু, পিণ্টু, বাঁশী, বটা, নোনা, তিনু। সব যেন অর্ডার দিয়ে তৈরী—নিখুঁত ছাঁচের স্প্রিং বসানো পুতুলের মত।

নরেনবাবু বেশ বদল করে এলেন। বুঝলাম নরেনবাবু যুবকই, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়। মুখের ওপরই শুধু রোদে ঝলসানো একটা তামাটে প্রবীণতার ছাপ পড়েছে ; নইলে তিনি গৌরবর্ণ সুপুরুষ।

বললাম—নরেনদা, এই বুঝি আপনার বংশধরবাহিনী ?

—এই সব নয়, আরও আছে। কোলেরটি এখন ঘুমিয়ে আছেন। নইলে ওকেও দেখিয়ে দিতাম।

—করেছেন কি নরেনদা !

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে নরেনদা বললেন—তোমাদের এই জায়গাটা বেশ জায়গা হে। সহর থেকে দূরে বলেই বেশ। যেমন জল-হাওয়া তেমনি জিনিসপত্র। যেমন সরেস তেমনি সস্তা। ধর খাটী দুধ, সহরে থাকলে আর টাকায় সাত সের করে পেতে হতো না। না, বেশ জায়গা ভাই।

নরেনদার মুখেই সব শুনলাম। ক বছর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, তায় আবার কড়া ডিউটি পড়েছে। সকাল নটায় খেয়ে দেয়ে থিয়ডোলাইট কাঁধে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চার মাইল একটানা প্যাডেল চালিয়ে প্রথমে যেতে হয় চন্দ্রপুরের ক্যাম্পে—রাস্তা মেটাল করা হচ্ছে। সেখানে তদ্বির শেষ করে শালবনের পথে পথে ছ মাইল দক্ষিণে গিয়ে ডাকবাংলোর মেরামত কাজটা দেখেন। সেখান থেকেও ছ মাইল পূবে গিয়ে লালবালু নদী। এখানে এখন জরিপ চলেছে শুধু, শীঘ্রই পুল তৈরি আরম্ভ হবে। কাজেই বাড়ি ফিরতে কখনও সন্ধ্যা, কখনও রাত হয়ে যায়।

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নরেনদা হাঁকলেন—সামনে এসেই দিয়ে যাও না। লজ্জা করার কিছু নেই। এ হল ভবানী, আমার এক ক্লাসের বন্ধু মানিকের ছোট ভাই।

দরজার আড়াল ছেড়ে নরেনদার স্ত্রী সামনে বেরিয়ে এলেন। চা-রুটি দিয়ে গেলেন।

বউদিকে দেখে বিস্মিত হলাম সব চেয়ে বেশী। বহু সন্তানবতী বাঙালী মেয়ের তো এমন চেহারা থাকা উচিত নয়।' ছবিতে কবিতায়

মেয়ে পাইলটদের চেহারার ভেতর যে নিটোল স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বউদি যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

—যুদ্ধের দরুন জিনিসপত্র কি খুবই মাগ্‌গি হচ্ছে ভবানী? কিছু খবর টবর রাখ?—নরেনদা প্রশ্ন করলেন।

সে খবর আমি রাখি না, আমার দরকারও নেই। নরেনদার কিন্তু শয়নে স্বপনে এই চিন্তা—বিশ্বভুবনে কোথায় কোন্ জিনিস সস্তা। গদগদ ভাষায় বর্ণনা করলেন—জাহানাবাদের গুড়, ডালটনগঞ্জের বেগুন, মধুপুরের মুর্গি।—কুকুরে ছোঁয় না হে এত সস্তা।

নরেনদার বর্ণনা শুনছি। কল্পনায় তিনি সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-স্বর্গগুলিকে জড়ো করে এক মহামহিম সস্তারাজ্যের ছবি দেখছেন, যেখানে তাঁর এক মাসের মাইনে বাহান্নটি মুদ্রার বিনিময়ে একটা তালুকদারি কেনা অসম্ভব নয়।

যুদ্ধের জন্য জিনিসপত্র মাগ্‌গি হচ্ছে, নরেনদা সে খবর রাখেন। নরেনদা তাই যুদ্ধের ওপর বড় চটা; সঙ্গে সঙ্গে জার্মানদের ওপরও বড় চটে গেছেন।

বললেন—এই জার্মানগুলো, বাড়িওয়ালাদের চেয়েও পাজি।

কথাটা কানে বাধল।

ক্রমে আলাপে আলাপে আরও অনেক কিছু জানলাম। গত তিন বছরে নরেনদা নিদেন পঁচিশবার বাসা বদল করেছেন। প্রত্যেক নতুন বাসাতেই প্রথম এসে কটা দিন থাকেন ভাল। অল্প দিনেই উন্মনা হয়ে পড়েন। তার পর হঠাৎ একদিন তাড়াহুড়ো করে তল্পিতল্পা নিয়ে নতুন একটা বাসায় চলে যান। বছরে আট দশবার করে গেরস্থালি গোছাতেই বউদির প্রাণান্ত হয়।

নরেনদা নিজ মুখেই বললেন—সহরে আধ কেউ আমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না।

—কেন বলুন তো ?

—কেন ? সে কি করে বলি।

—আপনিই বা অত ঘন ঘন বাসা ছাড়েন কেন ?

—অসুবিধে হয় তাই ছাড়ি।

—এর আগের বাসাটায় কি অসুবিধে ছিল আপনার ?

—সে আর ব'লো না। পাশের বাড়িটা থেকে দিবারাত্র বিশ্রী পোলাওয়ের গন্ধ আসতো।

অবাক হয়ে বললাম—তা হলে এ বাসাটাও হয়তো মাসখানেক পরে ছেড়ে যাবেন, ওই রকম কোন গন্ধ-টন্ধর জন্য।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে নরেনদা প্রতিবাদ জানালেন—না, না ; এ বাসাটি বেশ। এ জায়গা ছাড়া চলবে না। এইবার খাঁটী জায়গায় এসেছি।

একটু চুপ করে থেকে নরেনদা যেন স্বগত বলে উঠলেন—বাড়ি-ভাড়া'টাড়া কি মানুষে দেয়।

—কথাটা বুঝলাম না নরেনদা। তবে কি ভাড়া না দিয়ে থাকাটাই ভদ্রলোকের পক্ষে···।

নরেনদার যেন হুঁস হল। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—আহা, ভুল শুনছ কেন। বলছি, বাড়িভাড়া কি মানুষে নেয়!

মণ্টুরা সামনের ছোট মাঠটায় জামতলায় খেলছে। ডাকলাম—এই মণ্টু অ্যাণ্ড কোম্পানি! কাম্ আপ্।

যে যার বয়স আর সামর্থ্য মত সবেগে দৌড়ে এল। বললাম—সব সার বেঁধে দাঁড়াও। ক্যাঙ্গারু ড্রিল শেখাব।

ছেলেমেয়েগুলো অত্যন্ত চটপটে আর ফুর্ত্তিবাজ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ড্রিলটা বেশ সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করে নিল।

—ওয়ান, টু, থ্রী। ড্রিল চলেছে। পরিশ্রমে ঘেমে ওঠা মুখগুলো সব জলে ভেজা সাদা ফুলের মত দেখাচ্ছে। পেশীহীন শরীরের কোমল মাংসল আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে উচ্ছল রক্তের আভা। শেষে অর্ডার দিলাম—ডিসপার্স!

মণ্টু বলল—আবার কখন ড্রিল হবে কাকা?

—হবে এখন। এবার বাড়ি যাও।

এক ঝাঁক রাজহাঁসের মত মিঠে আওয়াজ করে মণ্টু কোম্পানি চলে গেল। উড়েই গেল মনে হল।

বারান্দায় বসে বই পড়ি। পড়া শেষ হলে আর কোনও কাজ থাকে না। অস্বস্তি বোধ করি। চারদিকে কত নয়নাভিরাম দৃশ্যবস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই হল।

বসে বসে দেখি রাজেনবাবুদের বাগানটা। দেশী বিদেশী ফুল, পাতাবাহারের কুঞ্জ—রঙের রূপোল্লাস। হেকার সাহেবের কেনেলটা চোখে পড়ে—চামড়ার পেনি পরানো তাজা তাজা আলসেসিয়ান, টেরিয়ার আর স্প্যানিয়েল। বাবুলালের মেঠাইএর দোকান—স্তূপীকৃত বালুশাই, বরফি আর শোনপাপড়ি। বেলজিয়ান ক্যাথলিক গির্জাটার হলের ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়— বিচিত্র রূপোর পুলপিট, মূর্তি, প্রদীপ আর কার্পেটপাতা গ্যালারি। লাল ফুলের বোঝা মাথায় কৃষ্ণচূড়াটার তলায় বুড়ো স্মিথের পোলট্রি। পেঁজা তুলোর মত পালকে ভরা ফাঁপানো পুচ্ছ—ঝক্‌ঝকে পুষ্ট পুষ্ট মোরগ আর মুরগী। রোড আইল্যাণ্ড, অরপিংটন, মিনরকা আর লেগহর্নের রঙিন ঝুঁটির শিহর, সুঠাম গ্রীবাবিলাস আর রক্তজবার মত কানের ঝুমকোর দোলা। এ দেখবার, উপভোগ করবার মত দৃশ্য।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে, সবচেয়ে নয়নাভিরাম—মানুষের কিশলয়মূর্তি ওই নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা যখন একান্ত উৎসাহে জামতলায় খেলে

বেড়ায়, পলায়নপর গোসাপের পেছনে দল বেঁধে তাড়া করে, বুড়ো টাট্টু ঘোড়ার কান ধরে নির্ভীক আনন্দে বাবুই পাখির মত ঝুলতে থাকে। ওদেরই দেখি বেশী করে।

•

প্রবল বর্ষা নেমেছে কদিন থেকে। নরেনদা বড় দেরি করে ফেরেন। মাঝে মাঝে দেখি লণ্ঠন নিয়ে মণ্টু আর বউদি বৃষ্টি আর অন্ধকারে অস্পষ্ট সড়কের দিকে তাকিয়ে নরেনদার জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ এখন রাত্রি বারোটা। তবুও মণ্টুরা দাঁড়িয়ে আছে। নরেনদা ফেরেন নি নিশ্চয়। উঠে যেতে হ'ল মণ্টুদের বাড়ি।

বললাম—তাই তো বউদি, রোজ যদি এমন সাংঘাতিক বর্ষা গায়ে মেখে দৌড়দৌড়ি করেন তাহ'লে—

বউদি বললেন,—তা হ'লে কি ?

—একটা অসুখ বিসুখ হয়তো—

—সেদিকে ভদ্রলোক ঠিক আছেন। একটা হাঁচি কাশিও হবে না।

বললাম—তা ছাড়া এত রাত্রে, জংলী পথে ...।

কথার মাঝখানেই বৌদি বললেন—ওই শুহুন, দয়া হয়েছেএতক্ষণে।

বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই একটা লক্কড় সাইকেলের ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ শোনা গেল। নরেনদা অকস্মাৎ পৌছে গিয়ে সকলকে উদ্বেগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।

বৃষ্টিতে ভিজে সোলার হ্যাটটা দু ইঞ্চি ফুলে গেছে। সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধা একবোঝা কুমড়োর ডাঁটা আর একটা লাউ। বললেন, —ছোট নদীটায় আটকে গেলাম। যা জলের তোড়! তা ছাড়া লাউটার জন্য চন্দ্রপুর হয়ে একবার ঘুরে আসতে হ'ল।

অনুযোগ করে বললাম,—বর্ষার রাত্রে জংলী রাস্তায় অত বেপরোয়া বেড়াবেন না নরেনদা।

সাইকেলের রডে গামছা দিয়ে বাঁধা বন্দুকটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নরেনদা বললেন—আমার এই কালো লাঠিটি যতক্ষণ সঙ্গে ততক্ষণ সত্যিই কিস্‌সু পরোয়া করি না, ভবানী।

আমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে প্রশ্ন করলেন—লাউটা কত হ'ল বল দেখি ভবানীচন্দর?

রাত নিশুতি, স্বপ্ন দেখার সময়; তখন আর লাউয়ের দাম আলোচনা করবার উৎসাহ আমার নেই। চ'লে আসতে আসতে শুনলাম, নরেনদা নিজেই ব'লে যাচ্ছেন—মাত্র দু পয়সা; যাকে বলে আধ আনা।

মণ্টু কোম্পানিকে ক্যাঙ্গারু ড্রিল শেখানো হয়ে গেছে। এর পর শেখালাম ডংকি জাম্প। এতে পিণ্টুই হ'ল ফার্স্ট। চার বছরের এই ছেলেটা পাঁচ ফুট উঁচু বারান্দা থেকে সোনাচিতার বাচ্চার মত অকুতোভয়ে লাফিয়ে পড়ে সত্যিই তাক্ লাগিয়ে দিল।

শেখালাম হরিণ দৌড়। এতে বাঁশী মেয়েটাই ফার্স্ট হ'ল।

দেখে শুনে নরেনদা একদিন বললেন—বেশ জুটেছ যা হ'ক। একে তো ত্যাঁদড়, তারপর তুমি আবার ট্রেনিং দিয়ে ঘাগী ক'রে তুলছ।

—ভাবছেন কি? একদিন গ্রেট বেঙ্গল কলোনি বসবে এখানে। এই তো সবে কাজ আরম্ভ করেছি। যা করছি পরে বুঝবেন।

—পরে কেন? এখুনি খুব বুঝছি। দু সের মাংস আনলাম, চেটেপুটে সব মেরে দিলে তোমার ওই মণ্টু কোম্পানি।

বললাম—তা, কি এমন পাপ করেছে?

—না, পাপ করে নি ঠিকই। তবে·· ···বোঝ না তো ভায়া!

মণ্টুদের নতুন ধরনের একটা স্যালুট শেখাচ্ছি। নরেনদা চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—ওদের একবার ছেড়ে দাও তো ভবানী, দরজী এসে ব'সে আছে।

মণ্টুদের সঙ্গে নিয়েই গেলাম। নরেনদা বললেন—দেখছ?

দেখলাম। ভালুকের না কিসের রোঁয়ার একটা লম্বা চওড়া পুরু কম্বল। যেমন খসখসে তেমনি ভারী।

—কি হবে এটা? জিজ্ঞাসা করলাম।

—এটা থেকে সব হবে। মণ্টুদের ছটি ওভারকোট হবে। তা ছাড়া আমারও ফতুয়ার মত একটা কিছু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বললাম—কি যাচ্ছেতাই করছেন, নরেনদা। ছেলেগুলোর গায়ের ছাল আর থাকবে না।

—খুব থাকবে। বোঝ না তো ভায়া।

নরেনদা দরজীকে কাজের নির্দেশ দিতে লেগে গেলেন।

শীত এসে পড়েছে। পশ্চিমের বড় বাড়িটাতে কারা এসেছে।

আলাপ হ'ল। হাওয়া বদলের জন্য এসেছেন বৃন্দাবনবাবু, তাঁর মা আর তাঁর ছেলে পেঁচো, পিণ্টুদের বয়সী। বৃন্দাবনবাবুর ডিসপেপসিয়া, পেঁচোর রিকেট। বৃন্দাবনবাবুর মা বিপুলাঙ্গী, মেদভারে মন্থর।

বৃন্দাবনবাবু বললেন—তুমি মানিকের ভাই? তা আগে বলতে হয়। তোমাকে তো আত্মীয় বলেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। যাক্·· ···তেলটা আর ঘিটা, এ যেন খাঁটি হয় ভবানী। এই বন্দোবস্তটা ক'রে দাও। পয়সা লাগুক কিন্তু জিনিষগুলো ভাল হওয়া চাই।

মাসীমা অর্থাৎ বৃন্দাবনবাবুর মা বললেন—একটা ভাল গয়লা ঠিক

ক'রে দাও বাবা। বাড়িতে দুয়ে দিয়ে যাবে। এবেলা পাঁচ সের ওবেলা তিন সের। একাদশীর দিন আরও দু সের।

—পয়সার জন্যে ভাবি না ভবানী। বাজিয়ে টাকা দেব, বাজিয়ে জিনিষ নেব। তোমার বাবাও তো শুনেছি বেশ কিছু রেখে গেছেন। হ্যাঁ, তোমার কাকাই বোধ হয়, একবার ধার চাইতে এসেছিলেন। আর……।

বৃন্দাবনদা তুবড়ির মত কথা ছড়িয়ে চললেন ; তার মধ্যে মাত্রার বালাই নেই। উত্তরের জন্য মুহূর্ত্তেকও অপেক্ষা না ক'রে আরম্ভ করলেন,—যাক্, দুটো ভাল চাকর, একটা ভাল ধোপা ; এ যেন কালকের মধ্যেই যোগাড় হয়ে যায় ভবানী।

মাসীমা বললেন—একটা ভাল ডাক্তারও ঠিক ক'রে দিতে হয় বাবা, পেঁচোর জন্যে। রোজ একবার এসে দেখে যাবে।

বড় বাড়ির মর্জ্জি ফরমাশ খেটে চলেছি। মণ্টুদের সঙ্গে কদিন দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না। নরেনদার দেখা পাওয়া তো আরও দুষ্কর। কিন্তু জানি ওরা সব ভাল আছে। ভাল থাকাটাই ওদের নিয়ম।

বউদির কোলের ছেলেটার এতদিনে ঠ্যাঙে জোঁর হয়েছে ; ট'লে ট'লে হাঁটে, জোরে হামাও দেয়। মণ্টুরা ওর নাম দিয়েছে—টাইগার।

মাঝে মাঝে রাত্রে দেখতে পাই, মণ্টুরা প্রদীপ জ্বেলে বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে পড়তে বসে। টাইগার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পড়ার ব্যাঘাত করে—প্রদীপ উল্‌টে দেয়। নরেনদা ব'সে ব'সে টাইগারকে সকল নষ্টামিতে উৎসাহ দেন। বউদি এসে প্রতিবাদ করেন।

তবু সুখের কথা। ভদ্রলোক বছরখানেকের ওপর এখানে টিকে গেছেন। শোনা যায়, জায়গার গুণে ক্ষ্যাপা হাতী ঘুমিয়ে পড়ে। এ তো মানুষ।

বড় বাড়ির চাকর রামদুলালকে আড়ালে পেয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁ রে, আট সের দুধ রোজ কে খায় বল্ তো? সবাই তো রুগী।

—বুড়ীমা খায়।

—বাজে বকিস না, ঠিক ঠিক বল।

—ঝুট কেন বলব বাবু। আমি নিজে দেখিয়েছে—একাদশীকা রোজ এক কড়াহি রস্‌গুল্লা বুড়ীমা একা খেয়ে ফেলিয়েছেন।

মণ্টুদের পুরো দলটি সঙ্গে নিয়ে একদিন চড়াও করলাম মাসিমার বাড়ি।

মাসিমা ছাঁচ থেকে খুলে থালায় সন্দেশ সাজাচ্ছেন। একটা কড়াতে রসগোল্লা ভাসছে, আর একটা জামবাটিতে কানায় কানায় ভরা ক্ষীর।

—এরা আবার কারা? মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন।

—এরা? এরা পৃথিবীর ছেলে। এদের সন্দেশ দিন।

মাসীমা খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন—আহা, বাপ মা নেই বুঝি?

—খাসা বাপ মা রয়েছে, বলেন কি? সন্দেশ দিন।

—কি যে ছেলেমানুষি কর ভবানী! কোন্ ঢঙে কথা বল বুঝতে পারি না বাবা। বলি, কাদের ছেলে এরা?

—নরেনবাবুর। ওই পূবের বাড়িতে যাঁরা থাকেন।

—তা, বউটির তো বড় কষ্ট!

—কষ্ট আবার কিসের?

—কষ্ট নয়? এতগুলো কুচোকাচা সামলানো; মানুষ করা।

—মানুষকে আবার মানুষ কি করবে?

—যা বোঝ না তা নিয়ে কাব্যি ক'রো না বাবা। এক পেঁচোকে নিয়েই বুঝছি কতবড় দায় ভগবান ঠেলে দেছেন মাথার ওপর!

পেঁচোর কথা উঠতেই নজরে পড়ল—ঘরের এক কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পেঁচো।

মানুষের চেহারার এত বড় ট্রাজেডি সহজে চোখে পড়ে না। জিরজিরে হাত পা, বুড়ো বাদুড়ের মত কেশবিরল মাথাটা। চার বছরের একরত্তি এই ছেলেটার ধড়ে কে যেন একটা ঝুনো সংসারীর মুখোস বসিয়ে দিয়েছে। মায়া হ'ল দেখে। আহা, রোগেই ছেলেটার এহেন দশা করে ছেড়েছে।

কিন্তু পেঁচো এগিয়ে আসছে। হাতে একটা বাঁশের লাঠি। তার উদ্দেশ্যটা খুবই স্পষ্ট; মণ্টুদের খানিকটা খোঁচাতে হবে এই তার মনের বাসনা।

মণ্টু পিণ্টু সকলে সভয়ে স'রে এসে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। বললে—কাকা, মারছে।

মাসীমা কটুকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কি মিথ্যুক রে বাবা, এই ছেলেগুলো! মারছে? কোথায় মেরেছে?

তার পর সুপ্রচুর আদর-রসে গলা ভিজিয়ে নিয়ে পেঁচোর উদ্দেশ্যে বললেন—যাও কাগ মেরে এস দাদু। যাও, এদের মারতে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। পেঁচোর করোগেটেড পাঁজরগুলো কেঁপে উঠলো দু তিন বার। তারপরেই একটা চীৎকার ছেড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে কেশবিরল মাথাটা নির্মমভাবে অবিশ্রান্ত মেঝের উপর ঠুকে যেতে লাগল।

—যা ভেবেছিলাম তাই। তোমরা একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়লে না। এখন সামলাতে গিয়ে প্রাণটা আমার যাক্। মাসীমা রাগ ক'রে বলে চললেন।

কান্না শুনে বৃন্দাবনদা এলেন। পেঁচোকে বিস্তর আদর অনুনয় ক'রে সুস্থ ক'রে তুললেন। বাঁশের লাঠিটা তুলে নিয়ে একবার মণ্টুর

একবার পিণ্টুর পেটে ঠেকিয়ে পেঁচোকে বোঝালেন—হেই মেরেছি। খুব মেরেছি। এইবার চুপ! হ্যাঁ এই যে, পাঁচুবাবু চুপ করেছে। পেঁচো বড় ভাল।

পেঁচো শান্ত হ'ল।

—কাদের ছেলেপিলে হে ভবানী? বৃন্দাবনদা জিজ্ঞাসা করলেন।

—নরেনবাবু ওভারসিয়ারের।

—এতগুলো! কত মাইনে পায় ভদ্রলোক? বৃন্দাবনদা মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময়ে কপাল কুঁচকে ফেললেন। এর কথাবার্তার রূঢ়তায় সত্যিই রাগ হচ্ছিল। বললাম—মাইনে কমই পায়। বাহান্ন টাকা। তাতে হয়েছে কি?

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বৃন্দাবনদা বললেন—গুলি করা উচিত!

—কাকে?

একটু থতমত খেয়েই যেন বৃন্দাবনদা উত্তর দিলেন—আহা, এদের নয়। এদের নয়। ওই নির্ব্বোধ লোকগুলোকে, প্রকৃত অপরাধী যারা।

আবার খানিকক্ষণ চিন্তাক্লিষ্ট থেকে হঠাৎ মণ্টুদের দিকে সঙ্গিনের মত ছুঁচলো তর্জ্জনীটা তুলে বললেন—এই যে কটা জীব………।

মণ্টুরা সকলেই একটু চমকে উঠল।

……জানি এরা নির্দ্দোষ, এরা পবিত্র। কিন্তু তবু, ছি ছি, সমাজকে এভাবে ট্যাক্স করা……।

কোমর-ভাঙা সাপের শানিত হিংস্রক দৃষ্টির মত বৃন্দাবনদার চোখ দুটো একবার চিকচিক করে উঠল। বললেন—এর একমাত্র উপায় কি জান? এই লোকগুলোর এই বাড়াবাড়ি, এত বাপ হবার সখ—অস্ত্রোপচারে একেবারে নির্ম্মূল করে দেওয়া।

বৃন্দাবনদার বক্তব্য শেষ হ'ল। আস্তে আস্তে আবার পুরানো

প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম—এইবার ছেলেদের একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন মাসীমা।

—থাম বাবা ভবানী। পেঁচোর কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। কাল না হয় আর এক সময় এদের নিয়ে এসো।

মণ্টুরা অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ি যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। বললাম—দাঁড়াও দাঁড়াও, লজ্জা কেন? দিদিমার বাড়ী সন্দেশ টন্দেশ খাও, তারপর যেয়ো।

মাসীমা বললেন—হাঁ, অনেকক্ষণ তো হ'ল। ওদের মা হয়তো ভাবছে।

—না, না। ভাববে কেন? ভাবনার কি আছে।

—কেমন মা রে বাপু! মাসীমা যেমন বিরক্ত তেমনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

বৃন্দাবনদাকে ইংরাজীতে বললাম—পেঁচোকে একটু স্থানান্তরে নিয়ে যান। মাসীমা ছেলেদের মিষ্টিমুখ করাবেন!

এতখানি অধ্যাত্মসাধনার পর মাসীমা অগত্যা বিচলিত হলেন। ভাঁড়ার থেকে শালপাতার ঠোঙায় গোটাকয়েক বাতাসা নিয়ে এসে বললেন—কই গো খোকাখুকীরা হাত পাত দেখি সব একে একে।

দেখলাম, মণ্টু পিণ্টু বাঁশী প্রত্যেকের হাত কাঁপছে। শঙ্কিত চোখে বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে। তিনু কেঁদেই ফেলল—বাড়ি চল কাকা।

মাসীমা তেতে উঠলেন—বড় বেয়াড়া নরেনবাবু না কার এই ছেলেগুলো। নেবে কি না বলে দাও ভবানী, আমি আর তপিস্তে করতে পারব না বাবা।

হঠাৎ, বাতাসার ঠোঙা হাতে মাসীমা তাঁর বিপুল দেহভার নিয়ে থপ থপ ক'রে চোরের মত দৌড়ে স'রে গেলেন। চমকে ফিরে

দেখলাম—অদূরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পেঁচো। এই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পেঁচোর চোখ থেকে বিষের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে যেন। আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। শশব্যস্তে মণ্টুদের বললাম—আর নয়, চল এবার যাই।

সমস্ত রাত্রিটা ঘুমাবার সময় পাই নি একরকম। নরেনদার সঙ্গে ধাই ডাকতে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কাল রাত্রে মণ্টু-ব্রাদারহুডের একটি নতুন সভ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

নরেনদা নিজেই রান্নাবান্না ক'রে আজকের সকালেও বেরিয়ে গেলেন সাইকেল নিয়ে—ডিউটি দিতে। মণ্টুরা অন্য দিনের মত ড্রিল করতে এবেলা আর এল না। ওদের উৎসবে পেয়েছে আজ। কেউ বাসন মাজছে, কেউ দিচ্ছে ঘর ঝাঁট, কেউ বা উনন জেলে জল গরম করতে ব্যস্ত।

আহার শেষে একটা আরাম নিদ্রার উদ্যোগ করছি। রামদুলার এসে জানালো—মাসীমা ডাকছেন, এখুনি যেতে হবে। একটুও দেরি করলে চলবে না। পেঁচোর অবস্থা খারাপ।

হন্তদন্ত হয়ে পৌছলাম বড়বাড়ি। মাসীমা অবসন্নভাবে একটা পাখা হাতে নিয়ে বসে আছেন। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—বাবা ভবানী, একবার উঠোনে এস আমার সঙ্গে।

আশঙ্কায় বুকটা ছমছম করে উঠল। নিদারুণ কিছু ঘটে যায়নি তো।

—উঠোনে? কেন মাসীমা?

—পেঁচো হেগেছে। কি সাংঘাতিক, দেখবে এস। সবুজ সবুজ ফেনা আর কালো ছিবড়ের মত মল। এখুনি ডাক্তারকে খবর দিতে হয় ভবানী।

একটা ন্যাকারের তোড় প্রায় গলা ঠেলে এল। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললাম—মাপ করবেন মাসীমা। রামদুলারকে পাঠিয়ে দিন। আজ আর আমার সামর্থ্যে কুলোবে না কোন কাজ।

চলে এলাম। এইখানেই বড়বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। আর ডাক পড়েনি কখনও।

সড়ক ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গিয়েছি। নরেনদা সাইকেলের আওয়াজে পথের নিশ্চিন্ত কাঠবিড়ালীগুলোকে সচকিত করে আসছেন।

—থামুন নরেনদা, কোথায় থাকেন আজকাল ?

নরেনদা থামলেন। কেরিয়ারে বাঁধা একটা পুঁটলি আর হ্যাণ্ডেলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা পেতলের ঘটি, তার মুখটা শালপাতা দিয়ে মোড়া।

—কেরিয়ারে কি, নরেনদা ?

—আতপচাল। তের পয়সায় দু সের।

—ঘটিতে ?

—দুধ।

—খুব রাবড়ি টাবড়ি চালাচ্ছেন বুঝি আজকাল ?

—না হে না। রাবড়ি না দুঃস্বপ্ন! গয়লা ব্যাটা দুধের দর চড়িয়েছে। বলে, টাকায় চার সেরের বেশী দেবে না। আমিও তেমনি, স্রেফ বন্ধ করে দিয়েছি। মাঝে মাঝে গাঁয়ে দেহাতে সস্তায় এক আধ সের এই রকম পেয়ে যাই, বাস্।

এ উত্তরের জন্য তৈরী ছিলাম না। এত অকপটে, অক্লেশে যে সোজা কথাগুলা বলে গেলেন নরেনদা তার প্রত্যুত্তর দেওয়া আর সম্ভব হ'ল না।

—যা যুদ্ধের বাজার পড়েছে! বিড় বিড় ক'রে নিজের মনে বকতে বকতে নরেনদা উঠে চলে গেলেন।

এমন কিছু ঘটেনি। তবু মনের মধ্যে সর্ব্বদা একটা মেঘলা গুমোটের ভার অনুভব করছি। সাইকেলে দুধের ঘটি ঝোলানো নরেনদার ঘর্ম্মাক্ত চেহারাটা থেকে থেকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বউদির কোলে ঘুমন্ত পায়রার মত পুচকে খোকাটার কথা। মনে পড়ছে স্বাস্থ্যে গড়া লাটিমের মত মণ্টু কোম্পানির কথা।

নরেনদা একটা চটের ছালাকে পাট করে সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধছেন, ডিউটিতে বার হবার উদ্যোগ করছেন। বললেন—চন্দ্রপুরের সাঁওতালদের কাছে মণ খানেক সরু চাল আছে। আজ বাগাতে হবে সস্তায়। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখনও গিয়েছ কি ভবানী—চন্দ্রপুর?

—না।

—যেয়ো একবার, ভারী সুন্দর জায়গাটা।

যেন একটা নতুন জগতের বার্ত্তা শোনাচ্ছেন, এমনিভাবে ব'লে চললেন—সুন্দর জায়গা। পাশের দেহাতে কি না পাওয়া যায়! আর কত সস্তা! ছাগলের দুধই পাওয়া যায় দিন সের পাঁচেক, আর তাও মাত্র পাঁচ আনায়।

কাছেই একটা বড় বিল—পানিফলে ঠাসা। বাঘা বাঘা মাগুর সব কিলবিল করছে। ধ'রে আনলেই হ'ল।···অড়হরের তো জঙ্গলই প'ড়ে রয়েছে। ওর আর চাষ করতে হয় না। এক ডাল খেতে খেতেই পরমায়ু ফুরিয়ে যায়।

নরেনদা চ'লে গেলেন।

প্রায়ই আজকাল দেখা সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু প্রথম দিনের দেখা সেই উৎফুল্ল মানুষটিকে আর পাই না। সেই প্রাক্‌মানবীয় শ্রমোৎসাহ যেন কতকটা ঢিমে হয়ে এসেছে।

মণ্টু কোম্পানিকে নিয়েও আজকাল অতটা হুটোপাটি করতে মন চায় না। বড় জোর একটা আবৃত্তি, একটা শেয়ালের স্কুল বা ওই রকম কোনও একটা কু'ড়ে খেলার মহড়া দিয়ে ছেড়ে দিই।

হয় আমার চোখের ভুল, নয় ব্যাপারটা সত্যি। মণ্টুদের বেশ রোগা রোগা দেখছি।

একদিন সন্ধ্যায় খবর পেলাম—নোনার জ্বর হয়েছে।

ব'সে ব'সে অনেক কিছু ভাবলাম। ঘটনাগুলা সব কেমন যেন একে একে ছন্দ হারিয়ে চলেছে। আমার গ্রেট বেঙ্গল কলোনির মাথার ওপর ক্রমেই জমে উঠছে বড় নোংরা অভিশাপের ঝড়।

নরেনদার ঘরে ঢুকতেই কানে এল—মালিশ, স্রেফ মালিশ ক'রে যাও।

বুকে কফ ঘড়ঘড় করছে, জ্বরে চোখ মুখ লালচে; নোনা চুপ ক'রে শুয়ে আছে। বউদি নোনার বুকে কি একটা মালিশ করছেন।

মাঝখানে প'ড়ে আপত্তি করলাম—ডাক্তার ডাকা উচিত।

নরেনদা বললেন—শোন কথা। হয়েছে তো সর্দিজ্বর, এইবার ডাক্তার এসে নিউমোনিয়া ক'রে দিক।

বললাম—ডাক্তার ডাকছি, পয়সা লাগবে না।

নরেনদার চোখ দুটো জ্বলে উঠল দপ ক'রে। কঠোর শ্লেষাক্ত স্বরে মুখ বাঁকিয়ে বললেন—তুমি কাঁচা নিমপাতা খাবে ? পয়সা লাগবে না।

দ'মে গিয়ে বললাম—আচ্ছা, আসি এবার।

নরেনদাও সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ভাষায় সমীহ ক'রে বললেন—হাঁ এস। তবে রাগ ক'রো না। জানই তো, লোকে সারে নিজের গায়ের জোরে আর নাম হয় ডাক্তারের।

কদিনের মধ্যেই বুঝলাম, নরেনদার কথাটাই সত্যি হয়েছে। নোনা সেরে উঠেছে। নরেনদা মাঝে মাঝে গান গাইছেন।

মনটা খুশী ছিল সেদিন—মণ্টুদের নিয়ে হৈ চৈ করার উৎসাহটা আবার পেয়ে বসল।

হাঁক দিলাম—এই পিণ্টু। স্ট্যাণ্ড আপ্। রেলিং-এর ওপর দাঁড়াও। জাম্প্।

পিণ্টু একবার হাঁটু মুড়ে লাফাতে গিয়েই আবার তাড়াতাড়ি সামলে নিল।

হাঁকলাম—জাম্প্ ডংকি, জাম্প্।

পিণ্টু আবার দম টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ পাঁয়তারা করল।

হাঁটু দুটো বেতালা কেঁপে উঠল বার কয়েক। তার পর লজ্জিত অপ্রস্তুতভাবে চুপ ক'রে দোষীর মত তাকিয়ে রইল।

রাগ চ'ড়ে গেল মাথায়—এ কি হচ্ছে পিণ্টু! কাওয়ার্ড!—জাম্প্!

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল পিণ্টু। বুকটা ওর ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠছে পড়ছে। ছোট ভুরু দুটোর ওপর ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শান্ত হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম—বললাম—আচ্ছা, নেমে এস। লাফাতে হবে না।—বাড়ি যাও সব।

মনে পড়েছে। আমাদের সাঁওতাল চাকরটা কাঁদতে কাঁদতে যা বলছিল—কদিনের জ্বরে ম'রে গেছে ওর ছোট্ট একটি ছেলে। ডাইনী আছে ওদের গাঁয়ে। তাকে চিনেও ফেলেছে সে; একদিন এর শোধ তুলবে।

আরণ্য বর্ব্বরতায় লালিত সাঁওতাল ছেলের সংশয়বিকার আজ আমারও যুক্তি রুচি শিক্ষা সব কিছুকে অন্ধকারের মত জড়িয়ে ধরছে পাকে পাকে। কে জানে, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়।

বড়বাড়ির খবর অনেকদিন রাখিনি। আমার প্রয়োজন সেখানে অনেক দিনই মিটে গেছে। তবে বৃন্দাবনবাবুরা এখন আর একা নন। একজনের বদলে আজ একটা সহরই তাঁর প্রতিবেশিত্ব করছে। রোজ

সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় দস্তরমত জনসমাগম হয়। সহরের সম্ভ্রান্তরাই আসেন—বাইরে দাঁড়ানো গাড়িগুলি থেকেই তার পরিচয় পাই। প্রায়ই নিমন্ত্রিতদের ভুরিভোজনের আনন্দ কোলাহল কানে ভেসে আসে।

—দাঁড়া রামদুলার। কথা আছে।

রামদুলার ঘাড় থেকে চিনির বস্তাটা নামিয়ে দাঁড়াল।

—কবে যাচ্ছে রে তোর বাবুরা ?

—এখন এক বছর থাকবেন।

—এক বছর ! কেন, কি হ'ল আবার ?

—এখন যাবেন কেন ? বাবুকা তনদুরুস্তি হচ্ছে, আজকাল আণ্ডা হজম করছেন। পেঞ্চোভি মোটায় যাচ্ছে দিনকে দিন !

একটা চিঠি পেলাম। বাড়িওয়ালা রাজেনবাবু সিমলা থেকে আমাকেই লিখেছেন—আমাদের বড়বাড়ির ভাড়াটে বৃন্দাবনবাবুকে আমার নমস্কার জানাবে। যথাসাধ্য ওদের সুখসুবিধার দিকে একটু নজর রাখবে। হাজার হ'ক, প্রতিবেশী।

আর আমাদের ছোট বাড়ির ভাড়াটে নরেন ওভারসিয়ার নামে লোকটা সাত মাস ভাড়া বাকী ফেলেছে। চিঠি দিয়ে কোনও উত্তর পাই না। মুরারী উকিলকে দিয়ে যথাশীঘ্র একটা রেণ্ট-স্যুট ফাইল ক'রে দিও। বেশী বদমাইসি করে তো ইজেক্‌শনের অর্ডার নিও। তোমার ওপর সব ভার দিলাম।

অনেক দিন পরে আবার পুরনো দিনের নির্জনতাকেই খুঁজছি সাধ ক'রে। পাশের এই দুটো বাড়িই খালি হয়ে যাক এই মুহূর্ত্তে—এই ধূমায়িত আবহাওয়া একটু পরিচ্ছন্ন হ'ক

মনের যত চাপা অভিমান ঢেলে ডায়েরিতে লিখে রাখলাম —আমার পরম হারানোর দিন বোধহয় ঘনিয়ে আসছে। একদিনের পাওয়া, এতদিনের পাওনা, গ্রেট বেঙ্গল কলোনির স্বপ্ন—সবই শুধু একটা ফাঁকি রেখে সরে পড়বে—ভাদ্র মেঘের চটুল ছায়ার মত।

পুবের বাতাসে শব্দ স্পন্দন থেমে গেছে—নিরেট একটা স্তব্ধতা। ধড়ফড় ক'রে উঠে জানালা খুলে তাকালাম।

হাঁ সত্যি কার্নিভালের ত্যক্ত আসরের মত প'ড়ে আছে জনশূন্য ছোট বাড়িটা। কোন মমতার চিহ্ন বালাই নেই সেখানে। দুটো গরু এরই মধ্যে বারান্দায় চ'ড়ে জাবর কাটছে। একটা কুকুর কড়ায় কুলুপ লাগানো দরজার অপরিসর ফাঁকটা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

—পালিয়েছে লোকটা। বুনো, বেদে, চোর······।

টেবিলের উপর থেকে রাজেনবাবুর চিঠিটা ছোঁ মেরে তুলে নিলাম, আত্মরক্ষায় বিমূঢ় প্রয়াসের মত। দৌড়ে এসে দাঁড়ালাম সড়কের ওপর। কতদূর গেছে ওরা?

বেশী দূর নয়—কদমের সারিটা পর্য্যন্ত।

চন্দ্রপুরের সড়ক ধরে মালপত্র বোঝাই গরুর গাড়িটা চলেছে আগে আগে। পেছনের গাড়িতে বউদি আর মণ্টুরা। পাশে আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে মাথায় সোলার হ্যাট চাপিয়ে নরেনদা চলেছেন।

পুরনো ইতিহাসের একটা ছেঁড়া পাতা উড়ে গেল সম্মুখে—নূতন তৃণভূমির স্বপ্ন দুচোখে, শস্যকণা প্রলুব্ধ যাযাবরের দিকে দিকে পাড়ি। পেছনের যত পরিচয় দুহাতে মুছে ফেলে, যত বন্ধ্যা মাটির ঢেলা অবহেলায় দুপায়ে মাড়িয়ে ওরা একদিন চলে যায়। ওরা বাঁধা পড়ে না কোথাও।

শক থেরাপী

ওয়াটকিনস্ মুরের ছেলে বেসিল মূর পাগল।

বুড়ো ওয়াটকিনস্ মূর ইণ্ডিয়ান আর্মিতে অফিসার ছিলেন। অবসর নিয়ে এখন থাকেন ছোটনাগপুরের এই সহরটীতে। খাস সহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ে টিবির ওপর ইউকালিপটাসে ঘেরা তাঁর বাংলো। নাম—দি রিট্রিট।

এই খাপছাড়া জায়গাটা বুড়ো মূরের এত পছন্দ কেন? এ সম্বন্ধে বুড়োর একটা বাঁধা বক্তব্য ছিল, যা তিনি এ পর্য্যন্ত সহস্রাধিক দেশী বিদেশী ভদ্রলোককে শুনিয়েছেন।

—এ বাংলোটা ঠিক আমাদের শায়ারের কাসেলের মত। আমরা ইয়র্কশায়ারের লোক, যারা গ্যালান্ট্রির জন্য বিখ্যাত। তা ছাড়া আমরা —দি মূরস্ অব ইয়র্কশায়ার—আমরা হ'লাম নীলরক্ত ব্রিটন। আজ দুশো বছর ধ'রে আমরা ওই একই গ্র্যাণ্ড ওল্ড কাসেলে বাস করে আসছি। আজ শিভালরীর টর্চ নিভে গেছে, তাই আমরা গরীব। যত জেলে হয়েছে অফিসার, ডিঙ্গি নিয়ে বোম্বেটি করাই নাকি বীরত্ব! ওদেরই মাইনে বেশী।

...কিন্তু ও-কাজ আমাদের ধাতে সয় না। অকৃতজ্ঞরা আজ ভুলে গেছে যে, ফরাসী ব্যারণদের হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে আমরা একদিন ডেলের মাটিতে সার দিয়েছিলাম। আজ আমাদেরই মাইনে কম।

...বিদেশ, এমন কি, কলোনিগুলোকেও আমি ঘৃণা করি। শায়ার আমাকে ডাকছে। শেষ বয়সে আমি পেতে চাই সে বাতাস, যে

বাতাসে নাইট টেম্পলারদের, আমার বাইশ পুরুষের নিশ্বাস মিশে আছে। এবার দেশে যাব।

...কিন্তু বড় কম পেন্সন। আমার ছেলে বেসিল আসছে। তাকে আর্মি সার্ভিসে একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ে তারপর। যাবার আগে ওর বিয়েটাও দেখে যেতে চাই।

সেই বেসিল এসেছে। একটা সাড়া পড়ে গেছে বিলিতী গিন্নী মহলে। মিসেস্ ওয়াল্টার মুসৌরীতে মেয়ের কাছে তার করলেন। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এল ক্লারা। কার্সিয়ং থেকে মিসেস্ স্টোকস্ আনালেন সিলভিকে। উটি থেকে চলে এল মিসেস্ লেনের মেয়ে আনা।

সহরের সাধারণ লোকেরাও চিনে ফেললো বেসিলকে। বড় ভালো হকি খেলোয়াড়। এবারে টুর্ণামেণ্টে ওই একা যজ্ঞের ঘোড়ার মত দশদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একা এগার জনের খেলা খেলে দিল। তাই এবার ট্রফি পেল একাদশ প্যান্থার—য়ুরোপীয়ান দল।

কিন্তু এ ক'দিনের মধ্যেই বুড়ো মূর দশবার রুমালে চোখের জল মুছেছেন। রাত জেগে প্রার্থনা করেছেন দুদিন।—আমার সম্মান, আমার রুটী, এই বয়সে ও লর্ড—যেন ধূলো হয়ে না যায়!

বুড়ো মূর বুঝেছে বেসিল পাগল। এ কথাটা এখনও অন্যত্র রাষ্ট্র হয় নি।

প্রাতরুত্থানের পর পাইপ ধরিয়ে বাগানে পায়চারী করতে বেরিয়ে এলেন বুড়ো মূর। একটা দৃশ্য দেখে হতবাক্ হয়ে থমকে রইলেন কিছুক্ষণ।—বেসিল বাংলোর মেথরাণীকে সসম্ভ্রমে একটা সিগারেট সাধছে।

রাগে রাজমাক বাহিনীর ত্রিশ বছরের ঝানু খুনিয়ার অফিসার

ওয়াটকিনস্ মূরের চোখে সকাল বেলার সূর্য্য নিভে এল। দিশেহারা হয়ে দুবার বেল্ট হাতড়ে রিভলবার খুঁজলেন,—একবার ফুলের টবটা তুললেন, তারপর সামলে নিয়ে গলা দিয়েই তোপ দাগলেন—বেসিল!

বেসিল এগিয়ে এল হাসিমুখে—গুডমর্ণিং ড্যাড।

—এস আমার সঙ্গে।

বুড়ো মূর বেসিলকে যেন বধ্য ভূমির দিকে নিয়ে চললেন। কিন্তু এলেন ড্রইংরুমে। বেসিলকে একটা কৌচের ওপর বসিয়ে প্রশ্ন করলেন —তুমি জান যে তুমি পাগল?

—না। তোমার অসুখ করেছে ড্যাড্। চোখ বড় লাল!

—চুপ! তুমি ভাল হতে চাও?

—নিশ্চয়।

—তবে এসব গর্হিত কাজ খবরদার করবে না। আজ সন্ধ্যায় ওয়াল্টারের বাড়ীতে চায়ে উপস্থিত থাকবে।

—আচ্ছা।

—খাঁটি ব্রিটনের মত ব্যবহার করবে।

—নিশ্চয়!

ওয়াল্টারের বাড়ীতে চায়ের আসরে নিমন্ত্রিতেরা বসে আছে। স্টোকস্ আর লেন গিন্নীও আছেন। মোহিনী সাজে সেজে বসে আছে ক্লারা, আনা ও সিলভি। প্রধান অতিথি বেসিল এখনো আসে নি। কিন্তু সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

বুড়ো মূর প্রমাদ গণলেন মনে মনে। অপরাধীর মত বললেন— আমি তো তাকে দেখে এসেছি পার্টিতে আসবার জন্যে পোষাক চড়াচ্ছে। বোধ হয় এসে পড়বে এখনি।

নীল সার্ট, লাল কোট আর হলদে ট্রাউজার পরে, একটা মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে আসরে অভ্যুদিত হ'ল বেসিল। মরমে মরে গিয়ে বুড়ো মূর অস্ফুট আর্ত্তনাদ করলেন—হেভেনস্!

ক্লারা, আনা ও সিলভি আতঙ্কে শিউরে চেয়ার ছেড়ে বুড়ীদের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। বুড়ো মূর বুকে সাহস বেঁধে বললেন,—তুমি ভুল করেছ বেসিল, এ ফ্যান্সি ড্রেসের আসর নয়।

মিসেস ওয়াল্টার—এটা ক্লাউনদের ক্লাব নয়।

মিসেস্ স্টোকস্—এটা জিপসিদের আড্ডা নয়।

মিসেল্ লেন—এটা সোসাইটী।

সকলের এই আপত্তি, বিক্ষোভ আর প্রশ্নের উত্তরে গালভরা হাসি হেসে বেসিল জানালো—খুব ক্ষিদে পেয়েছে না?

ক্লারা, আনা ও সিলভি, একসঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেল। উঁচুহিল জুতোর দ্রুত ঠকঠকিতে বেজে উঠলো তরুণীর হিয়ার নিদারুণ ধিক্কার।

ছাগশাবকের মত একটা লাফ দিয়ে উঠে বেসিলও চললো তরুণীদের অনুসরণ করে। সিঁড়ির কাছেই শোনা গেল সুতীব্র চিলের ডাকের মত তরুণীদের ভয়ার্ত্ত চীৎকার। তারা সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম করলো।

নিমন্ত্রিতেরা দৌড়ে এল সকলে। বুড়ো মূর গিয়ে খিম্‌চে ধরলেন বেসিলের কোটের কলার। পাইপটা দিয়ে খট্ করে মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন—ভুলে যাচ্ছ?

বুড়ীরা ততক্ষণে সপ্তমে গলা চড়িয়ে কোলাহল তুলেছে। ওয়াল্টার গিন্নী রুমাল দিয়ে ক্লারাকে হাওয়া করতে করতে কটুকণ্ঠে ধমকে উঠলেন—শীগগির তোমার জিপসি ছোঁড়াকে সরিয়ে নিয়ে যাও মিষ্টার মূর। অভদ্রতার সীমা আছে।

বুড়ো মূর বেসিলকে সেইভাবেই ধরে ছিলেন। এইবার একটি ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—চল শুয়োর ঘরে। দেখাচ্ছি মজা।

যেতে যেতে বুড়ীদের দিকে বিষদৃষ্টি হেনে বললেন—জিপসি? মূর ফ্যামিলির ছেলে জিপসি? ইউ ওয়ান্টার্স এণ্ড স্টোকস্ এণ্ড লেনস্…।

করিডরের প্রান্তে পৌঁছে আর একবার পেছনে তাকিয়ে বুড়ো মূর নিম্নস্বরে গালাগালিটা দিয়েই ফেললেন—ইউ হাফকাস্ট মংগ্রেল্স্!

বেসিল হো হো করে হেসে বললো—ঠিক বলেছ ড্যাড। যত সব পাগল!

বুড়ো মূরের সত্যই দুঃখের দিন আরম্ভ হয়েছে। বেসিলের উন্মত্ততা বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। বুড়োর সকল যুক্তি অনুনয় মিষ্টিকথা, সব নিষ্ফল হয়েছে।

বেসিল সমস্তক্ষণ থাকে ঘরের বাইরে। দিগ্বিজয়ীর উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে ঘাটে। বুড়ো মূর সমস্তক্ষণ বন্দী হয়ে পড়ে থাকেন বাংলোর ভেতর। সোসাইটিতে আর মুখ দেখাবার দুঃসাহস নেই তাঁর। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে অহর্নিশ ভৎর্সনার বিরাম নেই। বেয়ারা খানসামার মুখে বেসিলের প্রাত্যহিক কীর্ত্তিকলাপের খবর কানে আসে। বুড়ো মনের স্থৈর্য্য হারাতে বসেছে।

কিন্তু রেভারেণ্ড জ্যাক প্রায়ই আসেন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আশা ছেড় না মিঃ মূর। আমি বলছি, প্রডিগাল বেসিল একদিন ফিরে আসবে সুপথে।

সোসাইটীতে সকলে একবাক্যে ঘোষণা করেছে—পাগল না আরও কিছু! গভীর জলের বদমাস্।

এ-বছরেও বেসিল হকি টুর্ণামেণ্টে খেলতে নামলো, কিন্তু তরুণ সমিতির পক্ষে। জয়ী হলো তরুণ সমিতি। অন্যান্য টীমগুলো হিংসেয় মুসড়ে গেল বড়। সোসাইটীতে বুড়ো মূরের উদ্দেশে অভিশাপের বর্ষণ হয়ে গেল এক পশলা।

বেসিল ভিড়েছে তরুণ সমিতির সঙ্গে। তরুণ সমিতি নিজেকে ধন্য মনে করলো এই শ্বেতদ্বীপবাসী খেলোয়াড়ের সাহচর্য্য লাভ করে। সেক্রেটারী ধীরেন উকীলের বাড়ীতে ভোজের ব্যবস্থা করে বেসিলের সম্বর্দ্ধনা করা হলো।

বেসিল খিচুড়ি খাচ্ছে গোগ্রাসে। ধীরেনের জেঠামহাশয় রিটায়ার্ড সাব-জজ—শ্রদ্ধাপ্লুত চক্ষে দেখছেন এ দৃশ্য। বললেন—মাঝে মাঝে এ রকম এক আধটা মহাপ্রাণ ইংরেজ দেখা যায়। আমি চটকলের এক সাহেবকে জানতাম, বেচারা কত ভক্তি করে সত্যনারায়ণের সিন্নী খেতো!

জেঠামহাশয় বেসিলের সঙ্গে আলাপ করে বললেন—আর্মিতে না হয় আই পি এস-এ ঢুকে পড় মিঃ মুর। অফিসার না হলে কি তোমার মত ইংরেজকে শোভা পায়?

বেসিল সরোজের কানে কানে জিজ্ঞাসা করলো—ভদ্রলোকের মাথার কোন দোষ আছে না কি?

—আরে না, উনি হলেন ধীরেনের আঙ্কল্।

বেসিল হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অভ্যাগত কত ভদ্রলোক কত কুশলপ্রশ্ন করছেন, বেসিল সাড়া দিচ্ছে না কোন। সে তখন শুধু ঘাড়টা মোরগের মত কাৎ করে ঘন ঘন চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওপরে দোতলার জানলার দিকে, যেখানে ধীরেনের স্ত্রী, বোন, ভাইঝি এবং আরও পাঁচ ছটি কৌতূহলী তরুণীর মাথার জটলা।

এ অস্বস্তিকর দৃশ্যটা ভোজনরত তরুণ সমিতির সভ্যেরা সকলেই দেখলো। ধীরেন গম্ভীর হয়ে খেয়ে চললো তাড়াতাড়ি।

জানালার দিকে তাকিয়ে বেসিল ছাড়লো তীব্র কর্ণভেদী একটা শিষ।

কড়া মেজাজের লোক সরোজ। ভোজনান্তে বাইরে গিয়েই চেপে ধরলো বেসিলকে।—তুমি লেডিদের দিকে অমন অভদ্রের মত তাকাচ্ছিলে কেন?

—লেডি? বেসিল আশ্চর্য্য হলো।

—হ্যাঁ, ঐ জানালার দিকে?

বেসিল একগাল হেসে গলার স্বর নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো—মেয়েগুলো অমন বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল কেন বলতো? উদ্দেশ্য কি?

—আবার বলে মেয়েগুলো! বাড়ীর ঐ লেডিদের কথাই তো বলছি।

মুখ কাঁচু মাচু করে, মাথার টুপিটা বুকে ঠেকিয়ে বেসিল বললো—দোষ হয়েছে, মাপ কর। লেডিদের ডাক একবার, মাপ চেয়ে নি।

—না, থাক্।

—আমার অনুরোধ, ডাক একবার।

—আঃ চুপ করো। তুমি জাননা তাই বলছো। হিন্দু লেডিরা পরপুরুষের সামনে আসে না।

বেসিল আবার আশ্চর্য্য হয়ে কথাটার মর্ম্ম গ্রহণ করার চেষ্টা করলো!—পরপুরুষের সামনে আসে না? ওরা তা হলে বিয়ে করে কাকে?

সরোজ বেসিলের অবোধ্য খাঁটি বাঙ্গলায় একটা গালাগালি দিয়ে চুপ করে গেল শুধু।

বেসিলের এই বেয়াড়াপনার জন্য সকলের মনে যে একটু তিক্ততার সূচনা করেছিল, কতকগুলো কারণে তা মুছে এল ক্রমশঃ। বড় সাদাসিধে এই সাহেবটা। খাওয়াতে খরচ করতে কত উদার। ক্লাবে মোটা চাঁদা দেয়, শিকারে ঘোরার যত পেট্রলের খরচ ও একাই বহন করে। কটা চেহারা বাঙ্গালী ছেলের মনে যতটুকু দেমাক থাকার কথা, এই খাঁটি সাদাচামড়া সাহেবের মনে তাও নেই। মেমসাহেবরা একে পাগলা অপবাদ দেবে না কেন? নইলে ওদের আভিজাত্যের পায়া ভারি থাকে কি করে?

সরোজের বাড়ীতে সরস্বতী পূজোর ধূম। অনাহূত বেসিল নিজেই পৌঁছে গেল। সরস্বতী মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

ধর্ম্মশীল সরোজ ক্ষুব্ধ হ'ল মনে মনে। প্রকাশ্যে বললো—তুমি এসেছ? যাক্ ভালোই। তবে জুতো পায়ে অতটা এগিয়ে যেও না।

বেসিল বললো—দেখছি তোমাদের আইডল। বেশ মেয়েটি, আমার বড় পছন্দ হয়।

বেসিলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরোজ বুঝিয়ে দিলো—খুব ভেবে চিন্তে কথা বলবে। কখ্খনো কারো ধর্ম্ম নিয়ে ফষ্টি করবে না। কোন হিন্দু তা সহ্য করে না।

বেসিল সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে মাপ চাইলো—আচ্ছা, কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছি।—তোমাদের আইডল আমার পছন্দ হয় না। হলো তো?

তরুণ সমিতির থিয়েটার হবে। সব চেয়ে বেশী চাঁদা দিল আর পরিশ্রম করলো বেসিল। ষ্টেজ বাঁধা ব্যাপারে একাই দশটা কুলির কাজ করে দিল। দুপুরে বসে বসে গ্যাসবাতিগুলো বেসিলই ঘসে মেজে পরিষ্কার করে রেখে গেল।

গ্রীণরুমে সবে আলো জ্বলেছে। হুমড়ি দিয়ে ঢুকলো বেসিল।—Where are the heroines?

বীরেন ও রেবতী তখন দাড়ি কামানো আরম্ভ করেছে মাত্র। সরোজ বেসিলকে দেখিয়ে দিয়ে বললো—ঐ যে ওরা। এখনো ড্রেস করে নি।

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলো বেসিল। তারপর অত্যন্ত বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে বললো—পাগলামি পেয়েছ ইডিয়টস্? দাঁড়াও!

পট পট করে সব গ্যাসবাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে বেসিল সরে পড়লো। সরোজ প্রতিজ্ঞা করলো—এর প্রতিফল বুঝিয়ে দেব ব্যাটাকে। সেবার মাপ চাইতে ছেড়ে দিয়েছি। আবার বেয়াড়াপনা স্থরু করেছে!

তরুণ সমিতির ভুল ভাঙছে ক্রমশঃ। ধীরেন হয়েছে সব চেয়ে অতিষ্ঠ। রাত-বেরাতে গিয়ে বেসিল ডাকাডাকি করে। কখনো আবার নিঃশব্দে এসে বাগানে ফুলগাছের আড়ালে চোরের মত বসে থাকে। অনেক বোঝানো হয়েছে, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছে না। জেঠামশায় ধীরেনকে শাসিয়েছেন—ঐ রূপী বাঁদর যদি আবার বাড়ী চড়ে হল্লা করে তবে ওকে এবং তোমাকেও খড়ম পেটা করবো।

তবুও বেসিল মাঝরাত্রে এল ধীরেনকে ডাকতে। জেঠামহাশয় একটা হেস্ত নেস্ত করবার জন্য বেরিয়ে এলেন।

বেসিল জেঠামশায়কে দেখেই কুশল জিজ্ঞাসা করলো—কেমন আছ সিক্ ডগ্?

ধীরেনও এল। জেঠামহাশয় ক্রোধান্ধ হয়ে বললেন—এটা একের নম্বরের হারামজাদা হে ধীরেন। এই মাত্র কি বলেছে শুনেছ?

বেসিল পকেট থেকে বার করলো একটা বোতল আর ছোট একটা গেলাস। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জেঠামশায়—এই খবরদার। মন্দ টন্দ খেতে হয় ষ্টেশনের পায়খানায় বসে খেগে যা। ওঠ্ এখান থেকে।

অবিচলিত বেসিল বললো—চটো কেন আঙ্কল্? একে বলে হোলি ওয়াটার; ধীরেন খুব রেলিশ করে।

ধীরেনের মুখের দিকে জলন্ত চক্ষুপিণ্ড দুটি তুলে জেঠামশায় তাকিয়ে রইলেন।

এতদিনে তরুণ সমিতি বুঝেছে যে বেসিল আসলে পাগল নয়। ও অন্য কিছু। পেটে পেটে সূক্ষ্ম একটা উদ্দেশ্য খেলছে। ওর সঙ্গ আর কোন ভদ্রলোকের পক্ষে নিরাপদ নয়। ধর্ম্মে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করছে।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বাঁচাতে তৎপর হয়ে উঠলো। তরুণ সমিতি আর বেসিলের অন্তরঙ্গতায় ভাঙন ধরলো এতদিনে।

এবারের হকি টুর্ণামেণ্টে বেসিল খেললো বাহাদুর ক্লাবের পক্ষে। বাহাদুর কিলাব—বিড়িওয়ালা অক্ষয় যার সিকটারী, লতিফ মিস্ত্রি যার মানিজার, সব্জীওয়ালা প্রাণকুমার যার পিসিডেন। এ ক্লাবের খেলোয়াড়েরা বেশীর ভাগই মোটর বাসের খালাসী।

উন্নাসিক উষ্মায় ভদ্রলোকেরা মন্তব্য করলেন,—ইস্, অধঃপতন দেখি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সকলে লজ্জিত হলেন এই কথাটা ভেবে, একদিন এই নিকৃষ্ট রুচির লোকটাকেই তাঁদের ক্লাবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন তাঁরা।

বেসিলের অধঃপতন হয়েছে, কথাটা মিথ্যে নয়। কোন আপত্তি ওর গতিরোধ করতে পারছে না। অজস্র মূঢ়তার অনু পরমানু দিয়ে ও গড়ে তুলেছে নিজের এক বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। এক বিজাগতিক আহ্লাদে মজে আছে ওর সমস্ত সত্তা। কী অপ্রমেয় উৎসাহে, অদ্ভুত ক্ষুরধার নিষ্ঠার সঙ্গে স্তরে স্তরে সংসারের মাটি কেটে নীচে নেমে চলেছে সে। কোথায় যে পাগলের কোহিনুর লুকিয়ে আছে তা ওই জানে।

বেসিলকে দেখা যায় খুব ভোরে—হরিপদর রেস্টোরেন্টে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে চা ও সিঙ্গাড়া। পকেট হাতড়ালে দুচারটে বিড়িও পাওয়া যায় আজকাল। দুপুরে লতিফের আড্ডায় বসে তবলা পেটাপেটি করে। বিকেলে অক্ষয়ের বিড়ির দোকানে বেঞ্চের ওপর শুয়ে শুয়ে গ্রামোফোনের বাজনা শোনে। তালে তালে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মিঠে শিষ দেয়।

অপরিচিত কেউ এমন দীনহীন সাহেবকে দেখে মাঝে মাঝে দয়ার্দ্র ভাষায় প্রশ্ন করে—তোমার বাড়ী কোথায় সাহেব? বেসিল গম্ভীরভাবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—বেনারস।

সমস্ত দিন যেখানেই থাক, সন্ধ্যে হলে বেসিল অবধার্য্য পৌঁছে যায় প্রাণকুমারের বাড়ী। তার সান্ধ্য আড্ডা এইখানে।

কলকাতা থেকে গুণ্ডা আইনে তাড়া খেয়ে প্রাণকুমার এখানে এসে সব্জীর দোকান করেছে। সপরিবারে ভাল মানুষের মত দিনযাপন করে আজকাল। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও ছেলে—চম্পা আর কেষ্ট।

প্রথম দিন। প্রাণকুমারের বাড়ীর দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর বসলো দুই বন্ধুতে। কুলুঙ্গি থেকে প্রাণকুমার নামালো ধেনো মদের বোতল। কপাটের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চম্পা। বিস্মিত হয়ে বার

বার দেখলো বেসিলকে, ভিন্ন গ্রহের জীব আজকের এই নতুন অতিথিকে। বেসিলও থেকে থেকে চমকে উঠলো অদৃশ্য কাঁচের চুড়ির ঠুনকো হাসির শব্দে। আধভেজান কপাট লক্ষ্য করে ছুটে গেল তার শরবৎ দৃষ্টি।

পানীয় নিঃশেষ হতে প্রাণকুমার ডাকলো—এবার খাবার দিয়ে যাও।

চম্পা পর্দানশীন নয়। পরপুরুষের সামনে বের হতে লজ্জা বোধ করবে চম্পা সে জাতের বা সে সমাজের মেয়ে নয়। আগে ঠিক এইখানেই দাওয়ার ওপর বসতো জুয়াড়ীর আড্ডা। বখরা নিয়ে যখন হাতাহাতির যোগাড় হতো তখন চম্পাই এসে প্রাণকুমারকে ঠেলে নিয়ে বন্ধ করতো ঘরে। ঝাঁটা হাতে সামনে দাঁড়াতেই সব জুয়াড়ী সরে পড়তো একে একে।

আজ ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে চম্পা ঘেমে উঠলো। লজ্জা করছে তার। নিজেরই কাছে এ লজ্জা ধরা পড়ে চম্পা আরও লজ্জিত হলো।

আবার এলো ডাক—খাবার দাও শীগগির। অগত্যা আসতে হলো চম্পাকে। ছুটো থালায় রুটি তরকারী বয়ে নিয়ে সসঙ্কোচে চম্পা বেরিয়ে আসতেই বেসিল ব্যস্ত হয়ে টুপি হাতে উঠে দাঁড়ালো। প্রাণকুমার বললো—থাক্ হয়েছে, তুমি বসো। বেশী কায়দা করতে হবে না।

বেসিল পর পর তিনটে গান শোনালো। চম্পা ঘরের ভেতর লুটিয়ে পড়তে লাগলো হেসে হেসে।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে বেসিল দেখলো বুড়ো মূর তখনো বাগানে একটা সোফায় মুসড়ে নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। বুড়োর হাঁটুতে হাত রেখে বেসিল ডাকলো—ড্যাড!

—কে, বেসিল!

—সুসংবাদ ড্যাড। আজ একজন ইণ্ডিয়ান লেডির সঙ্গে পরিচয় হলো।

ছচোখ বিস্ফারিত করলেন বুড়ো মুর। —সর্ব্বনাশ! ভুল করেছ ডিয়ার বয়, মস্ত ভুল করেছ। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে লেডি হয় না। তুমি সয়তানের ছায়া দেখেছ।

বেসিল ওঠবার উপক্রম করতেই বুড়ো খুব মিস্টি করে বললেন—শোন বেসিল, কথা আছে। আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে তোমার কাজের চিঠি এসেছে। বল, কি উত্তর দিই?

—লিখে দাও, বেসিল মুর একজন পাগল।

—দূর হও। দূর হও।

—তুঃখ করোনা ড্যাড। আমি ভেবে দেখেছি আমি একজন পাগল।

প্রাণকুমারের বাড়ীর সান্ধ্য আড্ডাই এখন বেসিলের সমস্ত দিনের ধ্যান। প্রাণকুমারও ওকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছে। এখানে ওখানে তু'চারটে নিন্দের কথাও ওঠে নি তা নয়। তবুও।

নেশায় যখন প্রাণকুমার ঢলে আসে, বেসিলের চোখে তখন রং লাগে শুধু। হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে কেষ্টকে ডাকতে থাকে—কিসটো কিসটো। চম্পা অগত্যা বেরিয়ে এসে বলে—চেঁচিও না, আমার নিন্দে হয় জান?

—আচ্ছা বেশ। কিসটোকে পাঠিয়ে দাও, ওকে আদর করবো।

—না, এখন বাড়ী যাও। রাত হয়েছে।

এমনি এক বৈঠকে, প্রাণকুমারের নেশার জোর সেদিন একটু মাত্রার বাইরে। বললো—এ জীবন আর ভাল লাগে না। আমি মরবো।

বেসিল বললো—তুমি নির্ভয়ে মর। তোমার বউ ছেলের চার্জ নেব আমি।

—শালা মনহুস্! প্রাণকুমার খালি বোতলটা তুলে নিয়ে বেসিলের কানের ওপর জমিয়ে দিল প্রচণ্ড এক আঘাত। দুহাতে মাথা চেপে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো বেসিল। চম্পা বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে এসে প্রাণকুমারের হাত থেকে কেড়ে নিল বোতলটা—কালাপানি যাবার সখ হয়েছে?

বেসিলের কোটের আস্তিন থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। চম্পা ডাকলো—সাহেব। বেসিল সাড়া দিল না কোন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা। তারপর সোনালী চুলে ভরা বেসিলের মাথায় হাতটা রেখে আস্তে আস্তে আবার ডাকলো—বেসিল? সাহেব?

অর্দ্ধনিমীলিত চোখে প্রাণকুমার আবার তর্জ্জন করে বোতলটা তুলবার চেষ্টা করলো—এ্যাঁ চোখের সামনেই···।

হঠাৎ বেসিল উঠে বললো—মাপ করো। আমি আর কখনো ওকথা বলবো না। গুড বাই!

পরদিন প্রাতে বেসিলকে সহরে দেখলো না কেউ। খবরাখবরে সকলেই জানলো কি ব্যাপার। অক্ষয়, লতিফ, আরো অনেকে মারমূর্ত্তি হয়ে প্রাণকুমারকে চেপে ধরলো। —ক্ষ্যাপাটে বলেই তুমি ওকে কসাইয়ের মত মারবে? ওরই পয়সায় ঘটি ঘটি মদ গিলছো রোজ, লজ্জা করেনা? বাঘ না হয় তার পরিচয় ভুলে ভেড়ার দলে মিশেছে! তা বলে তাকে গুঁতোতে হবে?

চম্পা স্পষ্ট জানালো প্রাণকুমারকে—কিছু শুনবো না। যাও, যেখানে বেসিল আছে নিয়ে এস। নিশ্চয় জখম হয়ে ও কোথাও পড়ে আছে। ঐ জখম তোমাকেই ভাল করতে হবে।

একজন কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর এলেন।—বুড়ো মুর সাহেবের ছেলেকে মেরেছ তুমি? গুণ্ডামি করে সেরে যাবে

মনে করেছ? ইন্সপেক্টর প্রাণকুমারের একটা কান মুঠো করে ধরলেন।

মাথায় পটি বাঁধা বেসিল সাইকেল থেকে নামলো। সটান এসে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কে?

—আমি রায় বাহাদুর মহেশ্বরী সিং, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ।

—লুক হিয়ার পুলিশ ম্যান! তুমি যদি আমার কোন ব্যাপারে নাক ঢোকাতে আস, তা হলে সে নাক আমি এই রকম সমতল করে দেব। বেসিল তার জুতোর সোলটা তুলে দেখিয়ে দিল।

পুলিশ ইন্সপেক্টর চাপা রাগে ফুলে ফুলে বললেন—বেশ, তোমার বাবার অনুরোধ মত আমি ভাল করতে এসেছিলাম। এবার তাকে গিয়েই সব বলছি।

—হ্যাঁ, যাও।

এদিকে ওদিকে বেসিলের আর ভ্রূক্ষেপ নেই। সোজা দাঁওয়ায় উঠে ডাকলো—কিসটো! কিসটো। কপাটের ফাঁকে দেখা দিল চুড়িপরা হাত আর শাড়ীর আঁচল।

লতিফ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো—চলো ইয়ার! আমরা বৃথা কেন আর এখানে!

অক্ষয় বললো—হ্যাঁ চলো। এ বিলিতি সরবত বাবা। বড্ডো স্থগার!

প্রাণকুমারের পরিবর্ত্তন এসেছে। সংসারে এবার থেকে সে বেশ একটু আলগা হয়ে থাকছে যেন। বেসিলের মাথা ফাটানোর পর থেকে নিরন্তর একটা অনুশোচনা তাকে নরম করে দিয়েছে বড়। কোন ব্যাপারে আজকাল প্রতিবাদ তো করেই না, এমনিতেই কথা বলে কম।

চম্পারও পরিবর্ত্তন কিছু কম নয়। সন্ধ্যে হবার আগেই প্রত্যহ তার প্রসাধনের ব্যস্ততা বেড়ে উঠেছে অনেক। এক ছাঁদে দুটো দিন আর খোপা বাঁধে না। রকম সকম দেখে প্রাণকুমার দু'একবার ঠাট্টাও করেছে—কি ব্যাপার ? মেমদের ভাত মারবে না কি ?

•

এদিকের আকাশে ধীরে মিইয়ে এল গোধূলির ছটা। ওদিকে ঝাউবনের মাথার ওপর জাঁকিয়ে ভেসে উঠলো পূর্ণিমা চাঁদ। তিন শো চৌষট্টি দিনের সব হিসেব ভুল করার লগ্ন এল ঘনিয়ে। আজকের এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে প্রগল্‌ভ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠবে নরনারীর স্নায়ু। আজ হোলি উৎসব।

চকবাজারে আবীরের ঝড় উঠেছে। উদ্দাম ঢোলকের বাদ্য, চীৎকার, নাচ, খিস্তি গান আর কুঙ্কুমের মার চলেছে সেখানে। পিচকারী যুদ্ধে চকের পথটাও রঙে রঙে বিচিত্রিত। মাতালের বমির উপদ্রবে ড্রেনের ব্যাংগুলো উঠে পড়েছে সড়কে।

শ'পাঁচেক উৎসাহী দর্শক বৃত্তাকারে ঘিরে ডোমেদের সং দেখছে। তারই মাঝখানে গাধার পিঠে চড়ে পাগলা বেসিল—মাথায় টোপরের মত একটা বিস্কুটের টিন। ডোম ছেলেরা বিকট উল্লাসে চীৎকার করে বেসিলের গায়ে ছুঁড়ে মারছে মুঠো মুঠো ফাগ। বেসিলও অনুপ্রাণিত হয়ে গাধার পেটে লাথি মেরে চক্কর দিচ্ছে বোঁ বোঁ করে। মাঝে মাঝে ধেনো মদের বোতল মুখে উপুড় করে ঢেলে নিচ্ছে এক এক ঝলক, আর কড় কড় করে চকোলেট চিবিয়ে চলেছে।

চম্পা আজ দুপুর থেকে ঘরে বসে রান্না করেছে নানা রকম সুখাদ্য। আজ ঘরের বাইরে একটু উঁকি দিয়ে দেখবারও উপায় নেই। সেই মুহূর্ত্তে পথের ভীড় থেকে হাজার গলায় গর্জে উঠবে খেউড়ের উল্লাস।

চম্পা আজ পরেছে উৎসবের বেশ। ডুরে শাড়ী আর জরদা রঙের ঝুলা, তার ওপর রূপোর আভরণ। কোমরে ছড়িয়ে দিয়েছে চওড়া বিছুয়া, হাতে বাজু আর কঙ্কন, গলায় হাঁসুলি আর দুপায়ে ঘুঙুরদার ছড়া। সুর্মা টেনে চোখের টানা বাড়িয়েছে চিত্রা হরিণের মত।

চম্পা জানে প্রাণকুমার আজ আসবে না। কোন বছরই হোলির দিনে সে থাকে না। দুটো দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

কিন্তু। চম্পা আজ ভাবছে—বেসিল যদি আসে।

দাওয়ার ওপর মচ মচ জুতোর আওয়াজ। এক মুঠো ফাগ নিয়ে বেসিল এসে দাঁড়ালো।

—চম্পা!

ঘরের ভেতর শিউরে উঠলো চম্পা। বেসিল আজ তারই নাম ধরে ডাকছে। অন্যদিন ডাকে কেস্টোকে।

—আজ হোলি হায় চম্পা!

বাইরে আসতে হলো চম্পাকে। বেসিল হাতের ফাগ নিয়ে লেপে দিলো চম্পার মুখে। আঁচলে চোখ মুখ মুছে একটু সুস্থির হয়ে চম্পা দাঁড়িয়ে রইলো।

নেশায় তরল চোখের তারা দুটো তুলে চম্পার দিকে তাকিয়ে বেসিল বললো—চম্পা!

—কি বেসিল!

—তোমায় আজ একটা কথা বলবো। এবার চম্পার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। পালিয়ে যেতেও অক্ষম—পা দুটো অচল অনড় হয়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে চম্পা শেষে হাত জোড় করলো। মিনতি করে বললো—না, বলো না।

—উপায় নেই। আমি বলবোই।

—না, বলো না বেসিল।

মাথাটা থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ছে সামনে। কপালটা এক হাতে টিপে ধরে বেসিল তবুও দাঁড়িয়ে। চম্পা কপালের ঘাম আর চোখের কোন দুটো আঁচলে মুছে নিয়ে যেন দম ছেড়ে নিল। বললো—আচ্ছা, আর একদিন বলো।

—গুড নাইট! বেসিল শীষ বাজিয়ে সটান চলে এসে একটা রিক্সার ওপর বসলো তালগোল পাকিয়ে। চলো, দি রিট্রিট! গান ধরলো গলা খুলে—

…There was a green hill far away
And I saw her in a silvery night

উৎসবের প্রমত্ততা শেষ হয়ে আসে অবসাদ। চম্পার এল জ্বর—শুধু জ্বর। প্রথম দিন থেকেই বেহুঁস। প্রাণকুমার চিকিৎসার ত্রুটি করলো না। চম্পারই উৎসব দিনের আভরণগুলো একে একে বিক্রী করে ডাক্তার আর ওষুধের খরচ যোগানো হলো—ক্রমাগত সাত দিন ধরে।

হকি ম্যাচ থেকে ফিরে এসে বেসিল দেখলো সিভিল সার্জন মিত্র সাহেব চম্পাকে দেখে চলে যাচ্ছেন। পথরোধ করে দাঁড়ালো বেসিল—কি সার্জন? কার ট্রিটমেণ্ট করছো? রোগীর না তোমার মণিব্যাগের?

—কি বল্লে? আমার ট্রিটমেণ্টের কমপ্লেন করছো? তোমার সাহস তো খুব!

—সেই তো আমার দুঃখ। তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত, তা না করে শুধু কমপ্লেন করতে হচ্ছে।

—ভাল করে কথা বল মিষ্টার মুর। আমরা শুধু ভাল ট্রিটমেণ্ট করতে পারি। ভাল করা ভগবানের হাত।

বেসিল চট্ করে মাথার টুপিটা খুলে ভিক্ষেপাত্রর মত ধরলো মিত্র সাহেবের সামনে। বললো—যা কিছু ফী নিয়েছ ফেরত দাও। প্লীজ। ওগুলো ভগবানকেই দেব।

প্রাণকুমার এসে বেসিলকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যেতে যেতেই বেসিল আরও দুচারটে কথা শুনিয়ে গেল—আমার উপদেশ শোন সার্জন। শুয়োরের হাসপাতালে কাজ নাও। ওরা কমপ্লেন করে না।

প্রাণকুমারকে বেসিল বোঝালো—এদের ভরসা ছাড়। এরা বড় বুদ্ধিমান। আমি নিয়ে আসছি একজন এপথিকারী। ওদের বুদ্ধি কম—সর্ব্বনাশও করে কম।

সন্ধ্যের অন্ধকারে বেসিল সহরের সব অলি গলি ঘুরে বেড়ালো। একটা ইংরাজী লেখা বিবর্ণ সাইনবোর্ড খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিয়ে সে বাড়ীটার বারান্দায় উঠে ডাকলো—কবিরাজা!

কেরোসিনের ডিবরি হাতে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে এল লাটু কবরেজ। বেসিলকে দেখে পাঁশুটে হয়ে গেল তার মুখের রং। বললো—আমি তো সঞ্জীবনী রাখি না সাহেব।

—জর ভাল করতে পার? ভাল ফী দেব।

ধড়ে প্রাণ এল লাটুর।—জর? আমার খলের আওয়াজে জর পালায়।

—একদিনে পারবে?

—এক ঘণ্টায় পারবো। তবে ঐ যা বল্লে!

—আচ্ছা এস।

—নাড়ী দেখার জন্যে কিন্তু একস্ট্রা ছ'আনা নেব।

—বেশ পাবে।

—আর, মোক্ষম ওষুধ চাও তো সাত আনা লাগবে বলে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ পাবে। শীগগির চলো ম্যান।

লাটু তবুও বসে রইলো। আমতা আমতা করে দুবার মাথা চুলকে বিনীতভাবে বললো—সাহেব, আদ্দেক এড্‌ভান্স কর মাইরী!

—হোয়াট ম্যাডনেস! বেসিল লাটুর হাতে একটা সিকি ধরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে একরকম দৌড়েই পৌঁছল প্রাণকুমারের বাড়ী। চম্পার তখন আর জ্বর নেই; হিম হয়ে এসেছে হাত পা। হেঁচকি আরম্ভ হয়েছে।

আজ বেসিলের সান্ধ্য আড্ডা কাটলো আবগারী দোকানে। প্রচুর মদ খেয়ে এসে শুয়ে রইলো প্রাণকুমারের সব্জীর দোকানে—বেগুনের ঝুড়িগুলোর ওপর। গভীর রাত্রে পথে যেতে অনেকে শুনলো পাগলা বেসিলের কাতরানি।—সাহেবটা আজ বেহেড হয়েছে।

ভোরে, সূর্য্য ওঠার আগেই। চম্পাকে খাটিয়ায় তুলে নিয়ে শ্মশান-যাত্রী কুটুমেরা চলেছে। কেস্টকে কোলে করে সঙ্গে চলেছে প্রাণকুমার। পেছনে বাহাদুর ক্লাবের বিমর্ষ সভ্যবৃন্দ—লতিফ, অক্ষয় আরও অনেক। সবার পেছনে হকি স্টিক কাঁধে, একটা লম্বা খড় দাঁতে চেপে চলেছে বেসিল।

ক্ষীরগাঁও নদী—ফালির মত ঝিক্‌ঝিকে লঘু জলের স্রোত; চওড়া বালির চড়া। তারই ওপর এক জায়গায় চিতা সাজানো হয়েছে। মুড়িপোড়া বামুনেরা একটা আগুনের কুণ্ড রচনা করেছে—চন্দনকাঠ কাটছে কুচো কুচো করে। একটু দূরে বালির ঢিবির ওপর বসে আছে অক্ষয়, লতিফ আর বেসিল—অনাত্মীয় শ্মশানবন্ধুর দল।

চম্পাকে খাটিয়া থেকে নামিয়ে স্রোতের ওপর শোয়ানো হলো শবস্নানের জন্য। একটু গভীর জলে নিয়ে বার দুয়েক চুবিয়ে বালির চড়ার ওপর রাখা হলো।

কে একজন বললো—হাতের চুড়িগুলো রাখতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটা পাথর দিয়ে চম্পার কব্জি দুটো পিটিয়ে পিটিয়ে রূপোর চুড়ি দুগাছি খুলে নিলো।

পুরুত মিসিরজি বললেন—এবার ঘি লেপে দাও সর্ব্বাঙ্গে।

প্রাণকুমার এক থাবা ঘি নিয়ে মাখাতে লাগলো চম্পার পায়ে বুকে মাথায়। মিসিরজি বললেন—মাখ মাখ। এ সব কাজ একটু শক্ত হৃদয়ে করতে হয়। আত্মা যখন চলে যায় তখন আর কি থাকে? মিট্টিকা পুত্লা। এতে আবার লজ্জা!

হকি স্টিকটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে বেসিল উঠে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে ফর্ ফর্ করে উড়ছে ওর গলার লালরঙা টাই।

লতিফ বললো—বসো বেসিল। বসে বসে দেখ।

—না, বসবো না। টেরিবল্। ওরা রোষ্ট করবে এখনি।

মিসিরজি মন্ত্র পড়ছেন—ওঁ দেবাশ্চাগ্নি মুখা সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা…।

প্রাণকুমার ঘি মাখিয়ে চলেছে। বালিমাখা চম্পার মাথাটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে শাস্ত্রাচারের দাপটে। এলো চুলে লেগে আছে একটা শ্যাওলার চাপড়া। ভেজা ডুরে শাড়ী শ্লথ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে বালির ওপর।

হঠাৎ একটা পোড়া ইঁট ভীমবেগে মিসিরজির বুকে এসে আঘাত করলো।—বাপ রে বাপ। মিসিরজি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

লতিফ আর অক্ষয় চেঁচালো—ধর ধর, পাকড়ো।

—You Cannibals! বেসিল হকি স্টিক হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো শ্মশানবন্ধু জনতার ওপর। প্রাণকুমার এসে ধরলো বেসিলের চুলের ঝুঁটি।

বেসিল আজ আর কাউকে চিনতে পারছে না। থর থর করে

কাঁপছে ওর চোয়ালের হাড়। নীল চোখ দুটো তেতে জ্বলছে স্পিরিট-স্টোভের স্থির শিখার মত। লালমুখের কুঞ্চিত মাংসের রেখায় রেখায় প্রতিহিংসা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

শ্মশানকুটুমেরা ততক্ষণে কুড়িয়ে নিয়েছে এক একটা বাঁশ। দুমিনিটের মারেই বেসিলের হকি স্টিক খসে পড়লো হাত থেকে। লতিফেরা এসে ওকে একরকম হেঁচড়ে নিয়েই চলে গেল। পরিশ্রান্ত অক্ষয় হাঁফ ছেড়ে বললো—উঃ, বিলিতি পাগল; ভূতের চেয়েও সাংঘাতিক।

শ্মশান থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে লতিফ বেসিলকে ছেড়ে দিল—এবার বাড়ী যাও বেসিল।

ক্ষীরগাঁও নদীর সর্পিল বালুরেখা ধরে বেসিল চললো। দুপুরের সূর্য্য তেতে উঠেছে। কাকের দল নেমেছে স্রোতের জলে পাখা ধুতে। বালিয়াড়ির মরা গুগলি শামুক মাড়িয়ে বেসিল চললো।

সামনে পাহাড়তলীর চড়াই; পেছনে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত; অদূরে ইউকালিপটাসের ছায়ায় নিঝুম—দি রিট্রিট।

এখানে দেখবার কেউ নেই। বেসিল শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। বিকেল শেষ হ'ল, রোদ পড়ে সন্ধ্যে হ'ল। ঘুঘুর দল আশে পাশে ধানের শীষ খেয়ে চলে গেল। বেসিল টের পেল না কিছুই।

ঘুম ভেঙে বেসিল প্রথম চোখ মেলে দেখলো—সামনেই কাসেলের পিনাকেল; পাশে বড় একটা তারা উঠেছে। পেছনের অন্ধকারে, দিগন্তজোড়া মুরল্যাণ্ডের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা রয়েছে থমকে। একটা লার্ক ডেকে ডেকে উড়ে চলে গেল দূর হিলকের দিকে। এগিয়ে চললো বেসিল।

বাঁয়ে মাচান করা আঙুরের ইয়ার্ড ফেলে, মাঠভরা ভেজা ডেজি মাড়িয়ে বেসিল এগিয়ে চলেছে। আজ বাতাসে থেকে থেকে ভেসে আসছে এপ্রিল দিনের অর্কিডের মৃদু সুগন্ধ। অলিভ গ্রোভের অন্ধকার থেকে এক ঝাঁক ম্যাগপাই উড়ে পালিয়ে গেল তার পায়ের শব্দে। জীর্ণ অ্যাবির ইট পাথরের স্তূপ থেকে আসছে ঝিঁঝিঁর ডাক।

এবার বেসিল পৌঁছেছে ডাইকের কাছে। পুরানো সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে শুনলো—বহু দূরে ঝর্ণার জলঝরা গানের মত কাউন্টি চার্চের অর্কেষ্ট্রা। সামনেই বেলে পাথরের র‍্যাম্পার্ট—তারপর ফটক। নিরেট শতাব্দীর বাসা ঐ কাসেল। পিতামহের স্নেহে চেয়ে রয়েছে তার প্রতীক্ষায়।

বেসিল বেশ বুঝলো, তার ধমনী থেকে আজ নেমে গেছে একটা বিষের ভার। নতুন রকম লাগছে আজকের নিঃশ্বাস।

অযান্ত্রিক

বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড—প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্ব্বাঙ্গে একটা কদর্য্য দীনতার ছাপ। যে নেহাৎ দায়ে পড়েছে বা জীবনে মোটর দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না। দেখতে এমনি জবুথবু কিন্তু কাজের বেলায় অদ্ভুত-কর্ম্মা। বড় বড় চাঁইগাড়ীর পক্ষে যা অসাধ্য, তা এর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ জংলীপথে—ঘোর বর্ষার রাত্রে—যখন ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়ীই নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটী। তাই, সবাই যখন জবাব দিয়ে সরে পড়ে—একমাত্র তখনি শুধু গরজের খাতিরে আসে তার ডাক, তার আগে নয়।

ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে সারি সারি জমকালো তরুণ নিউ মডেলের মধ্যে বিমলের বুড়ো ফোর্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়—জটায়ুর মত তার জরাভার নিয়ে। বাস্তবিক বড় দৃষ্টিকটু। তালিমারা হুড, সুমুখের আর্শিটা ভাঙ্গা, তোবড়া বনেট, কালিঝুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো—সে এক অপূর্ব্ব শ্রী। পাদানিতে পা দিলে মাড়ানো কুকুরের মত ক্যাঁচ করে আর্ত্তনাদ করে ওঠে। মোবিল অয়েলের ছাপ লেগে সীটগুলি এত কলঙ্কিত যে, সুবেশ কোন ভদ্রলোককে পায়ে ধরে সাধলেও তাতে বসতে রাজী হবে না। দরজাগুলো বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, আর যদিচ বন্ধ হল

তো তাকে খোলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সীটের ওপর বসলেই উপবেশকের মাথায় আর মুখে এসে লাগবে ওপরের দড়িতে ঝোলানো বিমলের গামছা, নোংরা গোটা দুই গেঞ্জী আর তেলচিটে আলোয়ান।

বিমলের গাড়ীর দূরায়াত ভৈরব হর্ষ শোনা মাত্র প্রত্যেকটি রিক্সা সভয়ে রাস্তার শেষ কিনারায় সরে যায়—অতি দুঃসাহসী সাইক্লিস্টের ও ধাবমান বিমলের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে যেতে বুক কাঁপে। রাত্রির অন্ধকারে এক একবার দেখা যায়, দূর থেকে যেন একটা একচক্ষু দানব অট্টশব্দে হা হা করে তেড়ে আসছে—বুঝতে হবে ঐটি বিমলের গাড়ী। হেড লাইটের আলো নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, আলগা আলগা শরীরের গাঁটগুলো —যে কোন সময়ে বিস্ফোরকের মত শতধা হয়ে ছিটকে পড়বে বোধ হয়।

সব চেয়ে বেশী ধূলো ওড়াবে, পথের মোষ ক্ষ্যাপাবে আর কাণফাটা আওয়াজ করবে বিমলের গাড়ী। তবু কিছু বলবার জো নেই বিমলকে। চটাং চটাং মুখের ওপর দু'কথা উল্টো শুনিয়ে দেবে—মশাই বুঝি আর হাগেন না মোতেন না—চেঁচান না দৌড়ন না? যত করেছে বুঝি আমার গাড়ীটা!

কত রকমই না বিদ্রূপ আর বিশেষণ পেয়েছে এই গাড়ীটা—বুড়্‌ঢা ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস, কাণা ভঁইস! কিন্তু বিমলের কাছে সে জগদ্দল— এই নামেই বিমল তাকে ডাকে, তার ব্যস্ত-ত্রস্ত কর্ম্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরটি বছরের সাথী এই যন্ত্রপশুটা—সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।

সন্দেহ হতে পারে বিমল তো ডাকে, কিন্তু সাড়া দেয় কি? এটা অন্যের পক্ষে বোঝা কঠিন। বিমল খুবই বোঝে—জগদ্দলের প্রতিটি সাধ আহ্লাদ অভিমান বিমল পলকে বুঝে নিতে পারে।

'ভারী তেষ্টা পেয়েছে না রে জগদ্দল? তাই হাঁসফাঁস কচ্ছিস? দাঁড়া বাবা দাঁড়া।' জগদ্দলকে রাস্তার পাশে একটা বড় বট গাছের ছায়ায় থামিয়ে বিমল কুঁয়ো থেকে বালতি বালতি ঠাণ্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয়। বগ বগ করে চার পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদ্দল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।

এ ট্যাক্সির মালিক ও চালক বিমল স্বয়ং। আজ নয়, একটানা পনর বছর ধরে।

স্ট্যাণ্ডের এক কোণে তার সব দৈন্য জরাভার নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো জগদ্দল। পাশে হাল মডেলের বুইকটার সুমসৃণ ছাইরঙা বনেটের ওপর গা এলিয়ে বসে পিয়ারা সিং বিমলকে টিটকারী দিয়ে বলে—'আর কেন এ বিমলবাবু—এবার তোমার বুড়ীকে পেনসন দাও।'

—'হুঁ, তারপর তোমার মত একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে রাখি'—বিমল সটান উত্তর দেয়। পিয়ারা সিং আর কিছু বলা বাহুল্য মনে করে; কারণ বললেই বিমল রেগে যাবে আর তার রাগ বড় বুনো ধরণের।

কার্তিক পূর্ণিমায় একটা মেলা বসবে এখান থেকে মাইল বারো দূরে—সেখানে আছে নরসিংহ দেবের বিগ্রহ নিয়ে এক মন্দির। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে যাত্রীর ভীড়—চটপট সব ট্যাক্সিগুলো যাত্রী ভরে নিয়ে হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। শূন্য স্ট্যাণ্ডে একা পড়ে পড়ে শুধু ধুঁকতে লাগলো বুড়ো জগদ্দল। কে আসবে তার কাছে—ঐ প্রাগৈতিহাসিক গঠন আর পৌরাণিক সাজসজ্জা।

গোবিন্দ এসে সমবেদনা জানিয়ে বলল—কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না?

—না।

—তবে ?

—তবে আর কি ? এর শোধ তুলব সন্ধ্যেয়। ডবল ওভারলোড নেব, যা থাকে কপালে।

—ও করে আর কদিন কারবার চলবে। বরং এইবার আর দেরী না করে জগদ্দলকে এক্সচেঞ্জে দিয়ে ঝরিয়া থেকে আনিয়ে নাও মগনলালের গাড়ীটা। তোফা ছ'সিলিণ্ডার সিডান সত্যি।

—আরে যেতে দাও, কে অত ঝঞ্চাটে যায় বল ?

—এটা হল ঝঞ্চাট, আর নিত্যি এই লুকিয়ে পাকিয়ে ওভার-লোড নেবার হয়রাণি, সেটা ঝঞ্চাট নয় ?

—না ভাই যেতে দাও ওসব কথা। নাও, বিড়ি খাও।

গোবিন্দ চুপ করে গেল। জগদ্দলের প্রসঙ্গ পরের মুখে আলোচনা বিমল কোন দিনই বরদাস্ত করে না। চেপে যাওয়াই ভাল, নইলে এখনি হয়তো একটা ইতর ভাষা ব্যবহার করে বসবে।

বাজে কথায় মন না দিয়ে বিমলও ক্যানেস্তারা ভরে জল নিয়ে এল —পিচকারি দিয়ে বুড়ো জগদ্দলের ধূলোকাদা ধুতে লেগে গেল। হামা দিয়ে গাড়ীটার তলায় ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে পিচকারির জল ছড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, টাইরডের গলায় গোবরের দাগটা গেল কি না ? ডিফারেনসিয়ালের বর্ত্তুল পেটটা ন্যাতা দিয়ে ঘসে ঘসে চকচকে করে ফেলে। আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—আঃ হুডটা বেজায় পুরাণো, দু'জায়গায় ফেটে মস্ত বড় দুটো ফাঁক হাঁ করে আছে।

—কি করব জগদ্দল ! এবার তালি নিয়েই কাজ চালা। আসছে পূজোয় কটা ভাল রিজার্ভ পেলে তোকে নতুন রেক্সিনের হুড পরাবো। নিশ্চয় !

জগদ্দলের প্রসাধন এখানেই ক্ষান্ত হয় না। পকেট হাতড়ে বিমল

শেষ দুয়ানীটা বার করে—কেরোসিন তেল কিনে এনে বোল্টুগুলোর মরচে মুছতে লেগে যায়।

গৌর এসে বলল—'এ্যাঁ, এ কি হচ্ছে বিমলবাবু, ভাঙা মন্দিরে চুণকাম!

বিমল বিশ্রীভাবে মুখ বিকৃত করে খেঁকিয়ে উঠল—তা, সোজা কেটে পড় না রাজা এখান থেকে, কে তোমায় ধক ধক করতে ডেকেছে।

বিমল এইটেই বুঝে উঠতে পারে না যে, তার এইসব প্রাইভেট ব্যাপারে অপরে এত মাথা ঘামাতে আসে কেন?

'প্রাইভেট'—পিয়ারা সিং হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে।—'গাড়ীভি ঘরকা আওরাত হ্যায় ক্যা?

কারবার ডুবতে বসেছে, তবুও বিমলের ঐ এক রোখ। এই কুদৃশ্য বুড়ো গাড়ীটার ওপর একটা উৎকট মায়া তার কারবারী বুদ্ধিকেও দিয়েছে ঘুলিয়ে। তা না হলে এত বড় মক্ষিচোষক কৃপণ বিমল—যে ধানবাদে পুরির দাম বেশী বলে দিনটা উপোষে কাটিয়ে পরদিন গয়ায় ফিরে সস্তাদরে দুগুণ খাওয়া খায়; সেই বিমল অকুণ্ঠহাতে এ গাড়ীর পেছনে খরচ করে চলেছে, ভস্মে ঘি ঢালছে!

বুলাকি পাগলারও এমনি ধরণের স্নেহান্ধতা ছিল তার একটা ভাঙা টিনের গামলার ওপর। নিজে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজত, কিন্তু ছাতা দিয়ে সযত্নে ঢেকে' রাখতো তার ভাঙা গামলাটিকে।

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকার নেমে এল, দোকানগুলোতে দু'-একটা পেট্রম্যাক্স বাতি উঠল জ্বলে। ময়রার দোকানের উনুন থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারটা আরো পাকিয়ে তুলল। অদূরে ট্রাফিক পুলিশটাকেও একটু আনমনা দেখাচ্ছে। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে একদল

চাষী গেরস্থ আসছে এইদিকে—দূর দেহাতের যাত্রী সব। এই তো শুভ লগ্ন।

বিমল হাঁকল, গলা নয়তো যেন চোঙবিশেষ—চলা আও, চলা আও। রামগড়, রাঁচী, নযাসরাই। মকুদগঞ্জ, চিত্রপুর, ঝালদা। কনসেসান রেট—কনসেসান…।

আগন্তুক যাত্রিদলের কাণের ভেতর দিয়ে মরমে পৌছল এ ডাক। কনসেসান রেট—কিন্তু সংখ্যায় চোদ্দজন; বুড়ো জগদ্দলের উদর গহ্বরে ছ'জনের স্থানে ঠেসে দিল চৌদ্দজনকে। হুবহু কাঙ্গারুর পেট, কার সাধ্যি বোঝে বাইরে থেকে কটি জীব সেখানে প্রচ্ছন্ন। ক্ষিপ্র হাতে ঘুরিয়ে দিল স্টার্টিং হ্যাণ্ডেল—মাত্র দু-তিন পাক। মত্ত সিংহের মত বুড়ো জগদ্দল গর্জ্জে উঠল—পানের দোকানে লাল জলের বোতলগুলো কেঁপে উঠল ঠুং ঠুং করে। হর্ণের বিলাপে বাজার মাত ক'রে একটুকরো কাল-বোশেখীর মত জগদ্দল স্ট্যাণ্ড ছেড়ে ডাইনের সড়ক ধরে উধাও হয়ে গেল।

হাঁ, একখানা গাড়ী গেল বটে—পান-ওয়ালা বলল—'আজব এক চীজ হায় বিমলবাবুকা ট্যাক্সি।'

এই হল বিমলের নিত্য দিনের সংক্ষিপ্ত কর্ম্মসূচী।

জগদ্দলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়াটা ষড়যন্ত্র করেছে—এই রকম একটা সংশয় বিমলের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। সে দেখে আর আশ্চর্য্য হয়—উড়ন্ত চিলগুলোও বেছে বেছে ঠিক জগদ্দলের মাথার ওপর মলত্যাগ করে; পথচারী লোকেরা পান খেয়ে হাতের চূণটা নিঃসঙ্কোচে জগদ্দলের গায়েই মুছে দিয়ে সরে পড়ে। স্ট্যাণ্ডে আরো তো ভালমন্দ সাতাশটা গাড়ী রয়েছে; তাদের তো কেউ এতটা অশ্রদ্ধা করতে সাহস করে না। জগদ্দলই বা কার পাকা ধানে এমন মই দিল?

জগদ্দল! বিমল আস্তে আস্তে ডাকে, স্নেহে দ্রব হয়ে আসে

তার কণ্ঠস্বর। তার সকল মমতা রক্ষাকবচের মত জগদ্দলকে যেন এই সমবেত অভিশাপ আর নিত্য গঞ্জনা থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

—'কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল। আমি আর তুই আছি।'—একটা সুদর্পিত চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বিমল বেপরোয়াভাবে, বিড়িতে জোরে জোরে টান দিয়ে যেন প্রতিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়।

ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে এক আধটা দুর্দ্দিনও আসে, আকস্মিক আধি-ব্যাধি মেরামতও থাকে—তাই প্রত্যেক গাড়ীই এক আধবার কামাই দিতে বাধ্য। কিন্তু জগদ্দলের উপস্থিতি ছিল সূর্য্যোদয়ের চেয়েও নিয়মিত ও নিশ্চিত। সমব্যবসায়ী ট্যাক্সিচালক মহলে এ-ও একটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে। অন্ততঃপক্ষে বিমলের তাই বিশ্বাস। একটা খুনখুনে বুড়ো যদি দিনের পর দিন অনায়াসে লাফ-ঝাঁপ ডন-কুস্তি মেরে বেড়ায়, কোন্ জোয়ান না তাকে হিংসে করে ?

জগদ্দলকে নিয়ে এই সহেতুক গর্ব্বে বিমল ফুলে থাকত সর্ব্বদা। জগদ্দল—তার গত পনের বছরের বিলাসে ব্যসনে দুর্দ্দিনে নিত্য-সহচর—একাগ্র সেবায় তাকে পরিপুষ্ট করে এসেছে। দেব নরসিংহের কাছে কত লোক কত বিচিত্র মানত করে—কত রূপং দেহি যশো দেহি। বিমল দুপয়সার ফুল বাতাসা নরসিংহের পায়ের কাছে রাখে ; মনে মনে ধ্বনিত হয়—একান্ত প্রার্থনা, সামান্য একটু দাবী। 'হে বাবা, জগদ্দল যেন বিকল না হয়। এ-বয়সে আর আমায় সঙ্গীহীন করো না বাবা, দোহাই।'

'লোকটাও একটা যন্ত্র'—বেঙ্গলী ক্লাবে আলোচনা হয়।—'নইলে পনের বছর ধরে অহর্নিশ মোটরপ্রাণ মোটরধ্যান। এ মানুষের সাধ্য নয়।'

বিমল নিজেই বলে, পোড়া পেট্রলের গন্ধে ওর কেমন-বেশ-একটু মিঠে নেশা লাগে।

"আমিও যন্ত্র। বেঙ্গলী ক্লাব বলেছ ভাল।" বিমল খুশী হয়ে মনে মনে হাসে। "কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষের মতই, এ তত্ত্ব বেঙ্গলী ক্লাব বোঝে না, এইটেই যা দুঃখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে—বাজের ভীড়ে—এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে! আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরীব—জগদ্দল যেন এটুকু বোঝে।

আরবী ঘোড়ার মত প্রমত্ত বেগে জগদ্দল ছুটে চলেছে রাঁচীর পথে। সাবাস্ তার দম, দৌড় আর লোড টানার শক্তি। কম্পমান স্টিয়ারিং হুইলটাকে দুহাতে আঁকড়ে বুক ঠেকিয়ে বিমল ধরে রয়েছে। অনুভব করছে দুঃশীল জগদ্দলের প্রাণস্ফূর্ত্তির ছন্দিত শিহর। কনকনে মাঘী হাওয়া ইস্পাতের ফলার মত চামড়া চেঁছে চলে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো কম্ফোর্টারটা দু' কানের ওপর টেনে নামিয়ে দিল—বিমলের বয়স হয়েছে, আজকাল ঠাণ্ডাফাণ্ডা সহজে কাবু করে দেয়।

সুমুখে পড়ল একটা পাহাড়ী ঘাট—এই সুবিসর্পিত চড়াইটা জগদ্দল রুষ্ট চিতা বাঘের মত এক দমে গোঁ গোঁ করে কত কতবার পার হয়ে গেছে। সেদিনও অভ্যস্ত বিশ্বাসে ঘাটের কাছে এসে বিমল চাপলো এক্সিলেটার—পুরো চাপ। জগদ্দল পঞ্চাশ গজ এগিয়ে খং খং করে কঁকিয়ে উঠল। যেন তার বুকের ভেতর কটা হাড় সরে গিয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে বিমল শুনলো সে আওয়াজ। না ভুল নয়; সেরেছে আজ জগদ্দল—পিস্টন ভেঙে গেছে।

কদিন পরে মাঝ পথে এমনি আকস্মিক ভাবে বেয়ারিং গলে গিয়ে একটা বড় রিজার্ভ নষ্ট হয়ে গেল। তারপর একটা না একটা

উপসর্গ লেগেই রইল। এটা দূর হয়তো ওটা আসে। আজ ফ্যানবেল্ট ছেঁড়ে, কাল কারবুরেটারে তেল পার হয় না, পরশু প্লাগগুলো অচল হয়ে পড়ে—শর্ট সারকিট হয়।

এত বড় বিশ্বাসের পাহাড়টা শেষে বুঝি টলে উঠল। বিমল কদিন থেকে অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ—এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়। জগদ্দলেরও নিয়মভঙ্গ হয়েছে—স্ট্যাণ্ডে আসা বাদ পড়ছে মাঝে মাঝে। উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুরদুর করে। তবে কি শেষে সত্যই জগদ্দল ছুটি নেবে।

—"না আমি আছি জগদ্দল; তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভয় নেই। মোটরবিশারদ পাকা মিস্ত্রী বিমল প্রতিজ্ঞা করলো।

কলকাতায় অর্ডার দিয়ে আনাল প্রত্যেকটী জেনুইন কলকব্জা। নতুন ব্যাটারী, ডিস্ট্রিবিউটর, এক্সেল, পিস্টন—সব আনিয়ে ফেললো। অকৃপণ হাতে সুরু হলো খরচ; প্রয়োজন বুঝলে রাতারাতি তার করে জিনিষ আনায়। রাত জেগে খুটখাট মেরামত, পার্টস বদল আর তেলজল চলেছে। জগদ্দলকে রোগে ধরেছে—বিমল প্রায় ক্ষেপে উঠল। অর্থাভাব—বেচে ফেলল ঘড়ি, বাসনপত্র, তক্তপোষটা পর্য্যন্ত।

সর্ব্বস্ব তো গেল, যাক্‌। পনর বছরের বন্ধু জগদ্দল এবার খুশী হবে, সেরে উঠবে। খুব করা গেছে যা হোক; এবার নতুন হুড, রং আর বার্ণিস পড়লে একখানি বাহার খুলবে বটে।

রাত্রি দুপুরে জগদ্দলকে গ্যারেজে বন্ধ করার সময় বিমল একবার আলো তুলে দেখে নিল। খুশী উপচে পড়ল তার দু'চোখে। —এই তো, বলিহারি মানিয়েছে জগদ্দলকে। কদিনের অক্লান্ত সেবায় জগদ্দলের চেহারা গেছে ফিরে; দেখাচ্ছে যেন একটি তেজী পেশীওয়ালা পালোয়ান—এক ইসারায় দঙ্গলে ভিড়ে যেতে প্রস্তুত। হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লো বিমল—বড় পরিশ্রমের চোট গেছে কদিন।

কিন্তু কি আরামই না লাগছে ভাবতে—জগদ্দল সেরে উঠেছে; কাল সকালে সগর্জ্জনে নতুন হর্ণের শব্দে সচকিত করে জগদ্দলকে নিয়ে যখন স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াবে, বিস্ময়ে হতবাক্ হবে সব, আবার জলবে হিংসেতে।

হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। শেষ রাত্রি তবু নিরেট অন্ধকার। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল বিমল। —জগদ্দল ভিজছে না তো! গ্যারেজের টিনের ছাদটা যা পুরানো, কত ফুটো ফাটাল আছে কে জানে! কোন ফাঁকে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে হয়েছে আর কি! বডির নতুন পালিসটাকেও স্রেফ ঘা করে দেবে।

হারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে বিমল প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'আরে হায়! হায়! হায়!" ছাদের ফুটো দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে ঠিক ইঞ্জিনের ওপর। দৌড়ে শোবার ঘর থেকে নিয়ে এল তার বর্ষাতিটা; টেনে আনল বিছানার কম্বল সতরঞ্চি চাদর।

ইঞ্জিনের ভেজা বনেটটা মুছে ফেলে কম্বলটা চাপিয়ে দিল—তার ওপর বর্ষাতিটা। সতরঞ্চি আর চাদর দিয়ে গাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল ভেতরে; নতুন নরম গদিটার ওপর গুটিসুটি মেরে বিমল শুয়ে পড়ল; আরামে তার দু' চোখে ঘুমের ঢল এল নেমে।

পরদিনের ইতিহাস। স্ট্যাণ্ডের উদ্‌গ্রীব জনতা জগদ্দলকে ঘিরে দাঁড়ালো যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে। স্তুতিমুখর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিমলের অপূর্ব্ব মিস্ত্রী-প্রতিভার নিদর্শন। বিমল টেনে টেনে কয়েকবার হাসল। কিন্তু অস্বচ্ছ সে হাসি, একটা শঙ্কার ধূসর স্পর্শে আবিল।

কেন? বিমলের মন গেছে ভেঙে। জগদ্দল চলছে সত্যি, কিন্তু

কৈ সেই স্টার্ট মাত্র শক্তির উচ্চকিত ফুকার, সেই দর্পিত হ্রেষাধ্বনি আর দুরন্ত বনহরিণের গতি।

সহর থেকে দূরে একটা মাঠের ধারে গিয়ে বিমল বেশ করে জগদ্দলকে পরীক্ষা করে দেখল।

—'চল বাবা জগদ্দল! একবার পক্ষিরাজের মত ছাড় তো পাখা! চাপল এক্সিলেটার। নাঃ বৃথা, জগদ্দল অসমর্থ।

ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড, থার্ড—প্রত্যেকটি গিয়ার পর পর পাল্টে টান দিল। শেষে রাগ চড়ে গেল মাথায়। বলল—চল্, নইলে মারব লাথি।

অক্ষম বৃদ্ধের মত জগদ্দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে খানিক দূর দৌড়ল।

—'আদর বোঝে না, স্নেহ বোঝে না শালা লোহার বাচ্চা, নির্জীব ভূত!—বিমল সত্যি সত্যি ক্লাচের ওপর সজোরে দুটো লাথি মেরে বসল।

বিমলের রাগ ক্রমশঃ বাড়ছে, সেই বুনো রাগ। আজ শেষ জবাব জেনে নেবে সে। জগদ্দল থাকতে চায়, না যেতে চায়। অনেক তোয়াজ করেছে সে, আর নয়।

রাগে মাথাটা খারাপই হয়ে গেল বোধ হয়। বিমল ঠেলে ঠেলে দুমণি আড়াইমণি দশ বারোটা পাথর নিয়ে এলো। ঘামে ভিজে ঢোল হয়ে গেল তার খাকি কামিজ। এক এক করে সব পাথরগুলো গাড়ীতে দিল তুলে—একেই বলে লোড!

চল্। জগদ্দল চলল; গাঁটে গাঁটে আর্ত্তনাদ বেজে উঠল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। অসমর্থ—আর পারবে না জগদ্দল এ ভার বইতে!

এইবার বিমল নিশ্চিন্ত। জগদ্দলকে যমে ধরেছে—এ সত্যে আর সন্দেহ নেই। এত কড়া কলজে জগদ্দলের, তাতেও ঘুণ ধরল আজ।

কৃতান্তের কীট—আর রক্ষে নেই, এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদ্দল।

আমি শুধু রৈল্থ বাকী—পরিশ্রান্ত বিমল মনে মনে বলে উঠল। কিন্তু আমারো তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে, রগগুলো জোঁকের মত গা ছেয়ে ফেলেছে সব

—'জগদ্দল আগেই যাবে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা। যা জগদ্দল, ভাল মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে।—যা কোন দিন হয়নি তাই হলো। ইস্পাতের গুলির মতই শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু' ফোঁটা জল।

ফিরে এসে বিমল জগদ্দলকে গ্যারেজের বাইরে বেলতলায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। পেছন ফিরে আর তাকালো না। সোজা গিয়ে উঠোনে বসে পড়ল—সামনে রাখল দু বোতল তেজালো মহুয়া।

একটি চুমুক সবে দিয়েছে, শোনা গেল কে ডাকছে—বিমলবাবু আছ! গোবিন্দের গলা।

গোবিন্দ এল, সঙ্গে একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক।

—আদাব বাবুজী।

—আদাব, কোন্ গাড়ীর এজেন্ট আপনি? বিমল প্রশ্ন করল। গোবিন্দ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—'গাড়ীর এজেন্ট নন উনি; পুরানো লোহা কিনতে এসেছেন কলকাতা থেকে। তোমার তা গাদাখানেক ভাঙা এ্যাক্সেল রীমটিম জমে আছে। দর বুঝে ছেড়ে দাও এবার।

বিমল খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। ভবিতব্যের ছায়ামূর্তি তার পরম ক্ষুধার দাবী নিয়ে, ভিক্ষাভাণ্ডটি প্রসারিত করে আজ দাঁড়িয়েছে সম্মুখে। এমনিতে ফিরবে না সে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাই। বিমল ব্যাপারটা বুঝল।

—হাঁ আছে পুরানো লোহা, অনেক আছে, কত দর দিচ্ছেন ?

—চোদ্দ আনা মণ বাবুজী, মারোয়াড়ীর ব্যগ্র জবাব এল।—লড়াই লেগেছে, এই তো মওকা ; ঝেড়ে পুছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজী।

—হাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়ীটাও। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।

হতভম্ব গোবিন্দ শুধু বলল—'সে কি গো বিমলবাবু ?

নেশা ভাঙলো এক ঘুমের পর। তখনো রাত, বিমল আর এক বোতল পার করে শুয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে এসেছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বিমলের। বাইরের জাগ্রত পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল উপচে একটি শুধু শব্দ বিমলের কানে এসে আছড়ে পড়ছে—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। মারোয়াড়ীর লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ী টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলছে।

শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দের আবর্ত্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তার পরেই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং—জগদ্দলের সমাধি খনন চলেছে। যেন কোদাল আর শাবলের শব্দ।

দণ্ডমুণ্ড

অনুকূল গোঁসাই রামপুর জেলের শাস্ত্রী।

রামপুর সেণ্ট্রাল জেল। এককালে এইখানে কোন জংলী রাজার কেল্লা ছিল। এখন কিন্তু চেনবার উপায় নেই। ডঙ্কা বাজাবার তোরণগুলি ভেঙে ভেঙে কংক্রীটের গুমটি বসানো হয়েছে। গড়ের খাত ভরাট করে বসানো হয়েছে কলমী আমের বাগান—ল্যাংড়া, কিষণভোগ, হুসেনশাহ আর কালামানিক। সেকেলে পাঁচিলটা শুধু অটুট আছে এখনও—অজগরের পাকের মত।

গাঁয়ের লোকেরা বলে, ঐখানে ছিল রাজা জরাসন্ধের কারাগার। জেলের ভেতর দু'হাত মাটী খুঁড়লে এখনও পাওয়া যায়—শুধু হাড় আর হাড়।

গেট জমাদার বলে—জেলখানা না কিলখানা! নতুন কয়েদী এলেই জমাদার একবার হুঁসিয়ার করে দেয়—সামলে থেক বাপধন। নইলে ও চেহারার কিছু থাকবে না। স্রেফ বনমানুষ হয়ে যাবে।

রতন কম্পাউণ্ডার বলে—কলির কুম্ভীপাক! বটতলার পাঁজিতে ঠিক এই রকম একটা ছবি আছে। বাইরে থেকে যত খুনোখুনি যেন ঝেঁটিয়ে এইখানে জড়ো করা হয়েছে। সমস্ত দিন শুধু পাপী নিয়ে টানা-ছেঁড়া। বেতের মারে রক্ত গড়ায় কোমর ফেটে। ভাতবন্ধ দুর্বৃত্ত খাবি খায় চোরা কুঠরীতে। চর্ব্বি দিয়ে মাঞ্জা করা হয় ফাঁসী-ঘরের দড়ি। ছিটের জাঙ্গিয়া পরা নারকীদের দুরস্ত করা হয় বেণ্টের বাড়ি দিয়ে। দিনের পর দিন একটা বায়না করা সংহারের পালা চলেছে। এর মধ্যে কারু বিরক্তি, গ্লানি, সাধ অসাধের প্রশ্ন নেই।

রোগা রোগা ওয়ার্ডার, চিড়িতনের গোলামের মত জবরজং পোষাক। পিট্টিবিদ্যায় কী মজবুত হাত! ঝড়ের মত চড় ঘুসি চালায়—হাতের গাঁট্টাগুলি লোহা হয়ে গেছে।

কে না ভয় পায় ঐ অফিস ঘরটীকে? বিশেষ করে পোক্ত শিশুকাঠের ঐ আলমারীটাকে। ওপরের থাকে সাজানো প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভল্যুম—জেলকোর্ড আর ম্যানুয়েল। নীচের থাকে সারে সারে ফাইল।

প্রতি দিনের ডাকে কোত্থেকে ভেসে আসে কতগুলি নিঃশব্দ অক্ষর—জরুরী আর আধাজরুরী অর্ডার। জীবন মৃত্যুর ওলট পালট হয়ে যায় এদিকে। এর নড়চড় হয় না। এখানে আবেদন নিবেদন চলে না। শ্বাশ্বত বিধানের জাল পেতে বসে আছে নির্ব্বিকার ফাইল ব্রহ্ম। কয়েদ, সাজা, মুক্তি, চাকুরী, পুরস্কার, পেন্সন, ভাতা ও ছুটি—ভবলোকের যত শুভাশুভ গচ্ছিত ঐ ফাইলের পাতায় পাতায়।

বেঁটে মজবুত চেহারার প্রৌঢ় মানুষ অনুকূল গোঁসাই। পট্টি জড়ানো পা দুটো ছোট এক জোড়া গদার মত। অনুকূলের উগ্র রকমের নিয়মনিষ্ঠা, ওর কেতাদুরস্তী আচরণের কথা সেপাই মহলে সবাই জানে। উর্দ্দির পেতলের বোতামগুলিতে পালিশ দিতে ভুল হয় না ওর কোন দিন। বুট বেল্ট চক্‌চক্ করে। লোকটা যেন সারাক্ষণ ড্রিলই করছে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্প্রিংয়ের ওপর বসানো। কেউ একটা বিড়ি দিলে বুক চেতিয়ে, বুট ঠুকে, ফৌজী ঢঙে হাত পাতে।

ডিউটির শেষ হ'লেও ধুতি পরে থাকতে অস্বস্তি বোধ হয় অনুকূলের। কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো লাগে। শরীরটার ওজন নেই মনে হয়। হাঁটতে গিয়ে তাল থাকে না। বুটজোড়া পায়ে চড়িয়ে তবে অনুকূল সুস্থ হয়।

কাউকে হাই তুলতে দেখলেও অনুকূল চটে যায়। বিউগল পড়লেও যে কি করে লোকে আরও আধ মিনিট মটকা মেরে শুয়ে থাকে! আশ্চর্য্য!

মাইনে নেবার দিন, মাসের পয়লায় অনুকুলের কেতাদুরস্তীর পরাকাষ্ঠা জেগে ওঠে। প্যারেডে প্রাইজ পাওয়া গোটা দশেক মেডেল বুকের ওপর পিন দিয়ে ঝুলিয়ে, ফিটফাট উর্দ্দি বুট বেল্ট পট্টির সাজ পরে, স্যালুট দেগে ক্যাসিয়ার বাবুর কাউন্টারে এসে দাঁড়ায়। আঠারটী টাকা হাতে তুলে দু' পা পিছিয়ে আবার স্যালুট দেয়। শরীরটাকে এবাউট-টার্ণে একটা লঘুললিত মোচড় দিয়ে তাল মেপে পা ফেলে চলে যায়।

দোসরা তারিখে কাঁটায় কাঁটায় বেলা বারটায় মনিঅর্ডার করে আসে আটটী টাকা—শ্রীমতী নয়নতারা দেবী, ঝালদা, মানভূম। কুপনে বউকে একটী ছত্রে কুশল জিজ্ঞাসা করে। সমস্ত মাসে শুধু এই একবার। অতি কষ্টে লিখতে হয় অনুকুলকে। বন্দুক-ঘাঁটা কড়া-পরা ভোঁতা আঙুলে কলম আর চলে না।

বাইরের এই আচরণের মত অনুকূলের মনের ভেতরেও একটা ক্রুর রকমের সততা। পেটান লোহার পাতের মত কঠোর। সরকারী গাছের একটা এঁচোড় খেতে হ'লেও অনুকূল দরখাস্ত করে—ন্যায্য দাম দিতে চায়। আইন কানুনই ওর আত্মা। চাকুরীই সর্ব্বস্ব। আঠার আনা মাইনে দিলেও বোধ হয় শান্ত্রীগিরি ছাড়তে পারবে না।

বেড়ীপরা কয়েদীর পাল চরিয়ে ওয়ার্ডারেরা বাইরের ফার্মে নিয়ে চলেছে। খৈনি টিপে খোসগল্প ক'রে, আর ল্যাকপ্যাক করে হেঁটে চলেছে সব। অনুকূল আচমকা হুঙ্কার দিল—ফল্ ইন্!

হাঁকের দাপটে অপ্রস্তুত ওয়ার্ডারেরা লাইন বেঁধে ফেলে। এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে গাল দেয়—শালা কোথাকার জেনরেল যেন!

আই জি সাহেবের ড্রাইভার জেল ফটকে বসে ছিল। তাড়ির নেশাটা মাথার ভেতর একটু জোরে চাগিয়ে উঠতেই একটা গজল ধরলো গলা ছেড়ে। অনুকূল নিঃসঙ্কোচে তার ঘাড় ধরে ফটকের বাইরে পার করে দিল। ঠিক এমান নিঃসঙ্কোচে সে ঘাসখেকো গাধাগুলোকে ফুলবাগান থেকে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে ফটক পার করে দেয়।

সেপাইরা আর ওয়ার্ডারেরা অনুকূলের ওপর মনে মনে চটা। ওর মত অষ্টপ্রহর পল্টন সেজে মানুষে থাকতে পারে কি? তাছাড়া—ভেতর থেকে একটা পুরানো কম্বল, এক ঢেলা গুড়ও বাগিয়ে আনার উপায় নেই। অনুকূলের চোখে পড়েছে কি চুগলি হয়ে গেছে জেলার-বাবুর কাণে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। খালাস-পাওয়া কয়েদীরা গেট জমাদারের পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে মোটর বাসে চড়ে। পিত্তি জলে যায় অনুকূলের। মনে মনে এই জিজ্ঞাসাই ওকে অস্থির করে তোলে—চোট্টাদের যদি ছেড়েই দিতে হয়, তবে কেন এতদিন ধরে পোষা—এত হয়রানি! বলিহারি নিয়ম!

হাবিলদার বিমর্ষ হয়ে বলে—বউয়ের চিঠি এসেছে। ছেলেটা বড় বেয়াদপি আরম্ভ করেছে। রাত্তিরে লোকের বাগান ভেঙে বেড়ায়—দুটো আম লিচুর লোভে। কবার ধরা পড়ে মারধোর খেয়েছে।

অনুকূল বলে—যাও, বাড়ী গিয়ে এই বেলা ছোঁড়ার হাত দুটো কেটে দিয়ে চলে এস।

লক্ষ্মণ দুবে বলে—ভাইটা অবাধ্য হয়ে উঠেছে। স্কুলে দিয়েছি, পয়সা খরচ করছি। এদিকে সমস্ত দিন মেলায় মেলায় জুয়ো খেলছে।

অনুকূল—দিনের বেলায় ইটের ভাঁটায় কাজে লাগিয়ে দাও, বার ঘণ্টা কাদা ঠাসবে। আর রাত্তিরে মাহাতোদের ভাঁড়ারে জ্বাল দেবে আখের রস। ভোর পর্য্যন্ত ছিব্‌ড়ে ঠেলবে উনুনে।

মতি হালদারের ছেলে, এখনও বর্ণপরিচয় শেষ হয় নি। পায়খানায় বসে বিড়ি টানে। অনুকুল সমাধানের প্রস্তাব করে—একটা বিড়িতে ভাল করে কাঁচা গু মাখিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিও একদিন। ঢিট হয়ে যাবে।

ওয়ার্ডারদের ভাঙের বৈঠকে আলোচনা হয়—ধর, অনুকূল যদি জজ হতো।

—ওরে বাবা! প্রায় একসঙ্গে সকলে আঁৎকে ওঠে। ছাতুচোরেরও ফাঁসি হতো তা'হলে।

লক্ষ্মণ দুবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে—পেন্সন নেবার পর অনুকূল বড় জোর এক ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারবে।

বছর তিন চার পর একবার ছুটি নেয় অনুকূল—এক মাসের জন্যে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, দশটা দিনও দেশে কাটাতে পারে না।

সামন্তবাবুরা এসে বলেন—তুমি কেমন হে অনুকূল! আঠার টাকা মাইনেতে বিভূঁয়ে পড়ে রয়েছ। সঙ্গীন উঁচিয়ে, হুট বুট করা কি তোমার সাজে? তোমার বাবা ছিলেন আচায্যি মানুষ। চলে এস আমাদের কাছারীতে, তসিলদারী করবে।

অনুকূলের শালা এসে অনুযোগ করে—কি করছো দাদা! আজ ষোল বছর চাকরী করে ক'টা কড়ি জমিয়েছ বলতো? ঘরের দেয়াল

যে ধসে গেছে। দেশে বসে তসিলদারী, হোলই বা পনের টাকা। বিদেশের পঞ্চাশ টাকার সমান।

সব গোলমাল করে দেয় নয়নতারা।—তসিলদারী করলে কি ছোট হয়ে যাবে তুমি? পনের টাকা মাইনে তো ফালতু দক্ষিণে। চাল তেল নুন থেকে সুরু করে আম কাঁঠাল পর্য্যন্ত আর কিনে খেতে হবে না। দেখছো তো বৈকুণ্ঠ তসিলদারের নতুন বাড়ী—রাণীগঞ্জের টালি দিয়ে চাল ছেয়েছে।

বাস্, এইটুকুই যথেষ্ট। সেদিনের সন্ধ্যের ট্রেণেই অনুকূল বিদায় নেয়। গরম ছাইরঙা মিলিটারী সোয়েটার গায়ে চড়িয়ে, কাপড়-চোপড় পুঁটলি করে পিঠে ঝুলিয়ে, ভারি বুট দিয়ে ক্ষেতের আল মাড়িয়ে স্টেশনের পথ ধরে।—এমনি অন্ধকারে তারাভরা আকাশের নীচে, রাইফেল হাতে রামপুর জেলফটকের ডিউটি। রাত্রির পৃথিবীর রাজা, দণ্ডমুণ্ডের মালিক অনুকূল। সেখানে তার চ্যালেঞ্জের হাঁকে অন্ধকার কাঁপে, কমিশনার সাহেবের গাড়ী থেমে যায়।...আর তসিলদারী! থু থু ফেল এমন চাকরীর কপালে। চাকরী না চুরি? শালা সামন্ত!

আজকের রাতটা ভয় করার মতই। অন্ধকারটা যেন আজ হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমনই নিরেট। ঝাড়ের আলোতে জেলফটকের গরাদগুলো চক চক করছে অতিকায় হাঙ্গরের দাঁতের মত। অনুকূল শাস্ত্রী ডিউটিতে দাঁড়িয়ে সামান্য এক-একটা শব্দে অযথা চমকে উঠছে। অনেকদিন আগে এই রকম একবার হয়েছিল। সেদিন মা মারা গেছেন।

ফটকে পাহারা দিচ্ছে অনুকূল। আজ এই সুষুপ্ত চরাচরের সমস্ত পাপ পুণ্যের একমাত্র প্রহরী অনুকূল। কাঁকরগুলো তেতে আছে ফুটন্ত

তেলের মত। এক-একটি পদক্ষেপে ভারি বুটের স্পর্শে আওয়াজ বেরুচ্ছে—ছ্যাঁক ছ্যাঁক। এই শব্দে যত উদ্যতফণা পাপ অপরাধ যেন সভয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলবে গর্তের ভেতর। হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ঝাপ্টা দিয়ে উড়ে গেল। বাইনটটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার সহজ হয়ে নিল অনুকূল।

গুমটির ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুকূল একটু মুসড়ে যাচ্ছে! মুঠোর ভেতর থেকে আলগা হয়ে হেলে পড়ছে রাইফেল। একবার কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে অনুকূল আবার পায়চারী সুরু করলো। অনেকক্ষণ অন্ধকারে চোখ দুটোকে চুবিয়ে নিয়ে ভাল করে তাকালো সামনের দিকে। এইবার একটু ফাঁকা হয়েছে যেন। পাকুড় গাছটা দেখা যায়, জেল কম্পাউণ্ডের একেবারে শেষে, খাস সড়কের গা ঘেঁসে। যাক্, তবু টর্চ্চটা আনতে ভুল হয়নি আজ।

এখন তো শেষরাত্রি। অন্যদিন দু'চারটে শেয়াল ছোটাছুটি করে। গাছে গাছে বাদুড়ের উৎপাত চলে। বটফল ঝরে পড়ে টুপ টাপ। আজ সবাই চক্রান্ত করে বয়কট করেছে। অনুকূল আবার ঝিমিয়ে পড়লো।

হাঁটুর ওপর একটা মশা কামড়াচ্ছে। অনুকূল সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে একটা চড় বসিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চড়ের শব্দে তবুও গুমোট যেন হাল্কা হলো খানিকটা।

মচ মচ্! মচ মচ্! ভারি বুটের আওয়াজ। রাইফেলটা কাঁধে তুলে অনুকূল টান হয়ে দাঁড়ালো। একটা টিমটিমে আলো দুলতে দুলতে আসছে। অনুকূল চিতাবাঘের মত থাবা পেতে অন্ধকারে মিশে রইল অসাড় হয়ে!

—হল্ট, হুকমসদার! অনুকুলের গলাফাটা চ্যালেঞ্জে একজোড়া পেঁচা উড়ে পালিয়ে গেল পাকুড় গাছের কোটর থেকে।

—ফ্রেণ্ড !

—পাস ফ্রেণ্ড অলসোয়েল।

রাউণ্ডে বেরিয়েছে হাবিলদার। সামনে এগিয়ে এসে, বললো—ঠিক হ্যায়! আজ একটু চট্ পট্ থাকবে। আর রাত বেশী নেই। সাহেবরা এল বলে।

হাবিলদার চলে গেলে আবার সেই অন্ধকারের নেশা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে অকারণে। এমন তো কোন দিনই হয় না। পাগলা ঘণ্টি বাজবে নাকি আজ!

মুখের ওপর একটা শীতল কঠিন স্পর্শ। গুমটির গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনুকূল। রাইফেলটা হেলে পড়েছে। সুমসৃণ বাইনটটা ছোট ছেলের ঠাণ্ডা গালের মত লেগে আছে মুখের ওপর। অনুকূল ধড়ফড় করে উঠলো।

পাঁকুড় গাছের তলায় কিছু একটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারের চেয়ে আরও ভরাট মিশমিশে চেহারা। কে ও?

চ্যালেঞ্জ করবে কি না ভাবছে অনুকূল। চেপে গেলে চলবে না। সিঁদেল শালারা এই রকম তেল ভুসো মেখেই আসে। কোন্ ফাঁকে কি হয়ে যায় বলা যায় না।—হল্ট হুকমসদার! বুট ঠুকে হাঁক ছাড়লো অনুকূল—তার মনের সমস্ত ত্রাস যেন আওয়াজে থর থর করে উঠলো।

কোন উত্তর, সাড়া শব্দ নেই। শুধু রক্তজবার হাসির মত একটুকরো লাল দ্যুতি দপ করে ফুটে উঠলো অন্ধকারের বুকে—পাকুড় গাছের নীচে। একটা অগ্নিমুখ ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে।

দাঁতে দাঁতে চেপে রাইফেলটা তুলে অনুকূল এগিয়ে এল। কান দুটো তেতে উঠেছে। এইবার ঘোড়া দেগে ফেলবে। একটী ফায়ারে

ছেঁদা হয়ে লুটিয়ে পড়বে ঐ ছায়াশরীর, যেই হোক সে। বিকার রোগীর মত উত্তেজনায় মোচড় দিয়ে উঠলো অনুকূল। ঘোড়া থেকে হাতটা তুলে দাঁতে চেপে রইলো নিজেরই আঙুল। কিছুক্ষণ মাত্র!

গুমটির ভেতর থেকে হুকে ঝোলানো টর্চ্চটা নিয়ে এক পা দু পা করে এগিয়ে চললে অনুকূল। মূর্ত্তিটা তবু পালাবার নাম করে না। শঙ্কাহীন স্থৈর্য্যে সমাসীন। গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়ে অনুকূল টর্চ্চের বোতাম টিপলো। পাকুড়তলা ঝলসে উঠলো আলোয়।

মনের সুখে গাঁজায় দম দিচ্ছে পাগলটা। খুব বুড়ো একটা পাগল। কোমরে নেংটী আছে বলেই উলঙ্গ বলা যায় না। উটের পায়ের গাঁটের মত হাঁটু আর কনুইয়ে থাবা থাবা কড়া। অর্দ্ধেক পিঠ জুড়ে একটা পুরু দাদের আচ্ছাদন। জটপড়া পাকা চুলে সমস্ত মাথাটা ঠাসা।

রাগের কুঁচকে উঠলে অনুকূলের মুখ। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পাগলের কোমরে সজোরে একটী ঘা জমিয়ে দিল—শুকনো কাঠের ওপর টাঙির আঘাতের মত খটাস্ করে একটা ফাটা আওয়াজ। ঝুপ করে পড়ে গেল পাগল শুকনো পাতার স্তূপের ওপর।

অনুকূল ততক্ষণে রাগ সামলে নিয়েছে। গাঁজার কলকেটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, পাগলের পিঠে বাইনটের ছুঁচালো মুখটা আস্তে চেপে ধরলো।

—ওঠ! পাগল তবু নির্ব্বিকার। শকুনির মত নখ দিয়ে পিঠের দাদ চুলকোচ্ছে সে।

আর একটু জোরে চেপে অনুকূল বললো—দেখছিস্ ঐ ফটক। যেতে চাস্, বল?

আগুনে পোড়া সাপের মত তিড়বিড় করে লাফিয়ে উঠে পাগল। সোজা দৌড় দিল মরিয়া হয়ে। ভূতের ছায়ার মতই মিলিয়ে গেল সড়কের অন্ধকারে।

এতক্ষণ পরে তবু একটা এ্যাকশন হলো। অনুকূল হাসলো মনে মনে—একটু সামান্য বাইনটের খোঁচা, বাস্। কি রোগ না সারে অস্ত্র চিকিৎসায়? ফোড়া থেকে পাগলামী পর্যন্ত।

আবার ডিউটীর নেশা জমে উঠেছে। মার্চ্চের সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরছে দশ দিকে। হাতের মুঠো ঘেমে পেছল হয়ে উঠছে। ফুঁ দিয়ে হাত শুকিয়ে নিয়ে কাঁধবদল করছে রাইফেল—ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে।

পাপ আর পুণ্য রাজ্যের মাঝখানে, সীমান্তের আলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে অনুকূল—অতন্দ্র সেন্সরের মত। সমস্ত রাত আকাশেও যেন একটা তোলপাড় চলেছে। দূর ঝিলের ওপর খসে পড়ে বড় বড় তারা—সাবধানী শাস্ত্রীদের বুলেট ছুটছে সেখানে।

গুমটির কাছেই আমগাছটায় ঝিঁঝিঁর কীর্ত্তন আরম্ভ হলো একসঙ্গে। একেবারে কানের কাছে। মাথা ধরে উঠলো অনুকূলের।

ওখানে আবার কে? টেনিস কোর্টের কাছে, কাঠগোলাপের ঘেরানের পাশে? নিশ্চয় মালীদের ছোঁড়ারা। সাবাস্ দুঃসাহস। ক'দিন আগেই করবী গাছটাকে একেবারে নেড়া করে সমস্ত ফুল সাবড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাটারা বেকুব—সাদা কাপড় পরে এসেছে চুরি করতে। দফা সেরেছি আজ শালাদের। হাত-পা বেঁধে শোরের মত ফেলে রাখবো আজ—হিম খাওয়াবো সমস্ত রাত। তারপর হাজতের মশা।

পা টিপে টিপে এগিয়ে টর্চ্চ টিপলো অনুকূল।

মালীর ছেলেরা কেউ নয়। ভুঁড়ো শেয়াল একজোড়া। একটা বিষঘায়ে পচা কাটা-পা কুড়িয়ে এনে, জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা খুলছে টানাটানি করে। আইডোফরমের ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাসে কাঠ-গোলাপের মিঠে গন্ধটুকু মারা পড়েছে।

—ধুর! ধুর! শেয়াল দুটোকে তাড়িয়ে দিয়ে অনুকূল ফিরে এল ফটকের গুমটিতে।

প্যারেডের মাঠে আবার কারা? না, বার বার চোখের ভুল নয়। বেশ স্পষ্ট। এগিয়ে এসে অনুকূল মাঠের একটা পোষ্টের কাছে দাঁড়ালো।

টুং টুং মিঠে চুড়ির শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে অনুকূল শুনলো সে আওয়াজ। না মিথ্যে নয়। ছি ছি, কি নির্লজ্জ দুঃসাহস! এ যে প্যারেডের মাঠ, জেল এলাকা। সতর্ক দৃষ্টি রেখে অনুকূল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ, তবু তারা যায় না। অনুকূল বিমনা হয়ে গেছে।—আজকের এই অন্ধকারে হৈমন্তী হিমের রোমাঞ্চ। কুয়াশায় কস্তুরী নেশার বিহ্বলতা। অলজ্জ বাহুপীড়নে যৌবন বিলিয়ে দেবার মত এই শক্ত মাটীর ওপর ভেজা ঘাসের বিছানা। কতদিনেরই বা কথা—বিয়ের আগে, তখন নয়নতারা কতই বা বড়। ঝালদার মেলার ভীড়ে খোঁপা টেনে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

চমকে উঠলো অনুকূল। আজ গুলি খেয়েছে নাকি সে। ডিউটীতে দাঁড়িয়ে এসব ছেলেমানুষি চিন্তা। নিজের ওপর রাগ হলো অনুকূলের। হোক্ কেলেঙ্কারী, আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।

টর্চ্চ টিপলো অনুকূল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বোকার মত সটান গুমটিতে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে রইল।—জেলমুদী রামু শেঠের কুত্তি বিলি, গলার বকলসে ঘুণ্টি বাঁধা। আর একটা গোত্রহীন পথের কুকুর। বিলির ঘুণ্টি থেকে থেকে অন্ধকারে বাজছে—ভামিনী অভিসারিকার নূপুরের মত।

মোটরের হর্ণের চাপা গম্ভীর আওয়াজ। হেড লাইটের আলো ধূমকেতুর লেজের মত ছড়িয়ে পড়েছে সড়কের ওপর। দুটো গাড়ী গোঁ গোঁ করে এসে দাঁড়ালো ফটকের কাছে।

সাহেবেরা এসেছে। জেলারবাবু, ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার

এসেছে। ঘুমভরা চোখ—নিশির ডাকে ঘর ছেড়ে হঠাৎ বেঘোরে চলে এসেছে সব।

সাড়া শব্দ নেই কারু মুখে। বড় জমাদার ফটকের কুলুপ খুলছে। গরাদ আঁটা ছোট লোহার দরজাটা কঁকিয়ে কঁকিয়ে ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হলো।

—ওঃ হো! আজ গোপী দোসাদের ফাঁসি!

সমস্ত জড়তা মুহূর্ত্তে উবে গেল। চিঁড়িয়াখানায় খাঁচায় পোরা বাঘের মত লাফিয়ে ঘুরে ফিরে একটানা পায়চারী আরম্ভ করলো অনুকূল।

কার্ত্তিক মাসের রাত, তার ওপর কুয়াশার ঘোর। ফর্সা হতে অনেকক্ষণ। শিশিরের ফোঁটা ঝরে পড়ছে বটপাতা থেকে। ফটকের কার্ণিশ হিমে ভিজে উঠেছে। এখনও কাকের রা নেই, নেশা করে ঘুমিয়ে পড়েছে সব। আজ সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা কালাপানির বাষ্প থমকে রয়েছে।

—হল্ট, হুকমসদার! অনুকূলের চ্যালেঞ্জ আছড়ে পড়লো স্তব্ধ অন্ধকারের ওপর। বিভীষিকা ভেদ করে হনহনিয়ে ফটকের দিকে বেপরোয়া চলে আসছে কে? অনুকূল তাক্ করার জন্যে রাইফেল নামালো। কিন্তু না, একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

—আমি গোপীর মা!

বুড়ী আর তার সঙ্গে বছর চারেকের ন্যাংটো একটা ছেলে বুনো বেড়ালের মত তুড় তুড় করে এগিয়ে এল।

ফটকের আলোতে নিয়ে গিয়ে অনুকূল বুড়ীর হাতের সার্টিফিকেটটা দেখে নিল। বুড়ী লাস্ নিতে এসেছে সৎকারের জন্য।

—আয় হাবা। আঁচল দিয়ে হাবাকে আর নিজের নাক পর্য্যন্ত ঢেকে, চোখ দুটো শুধু খোলা রেখে বুড়ী থাম ঘেঁসে বসে রইল।

ডিউটীর পিনিক চড়েছে অনুকূলের মাথায়। তাঁতের মাকুর মত মার্চ্চ জমিয়েছে কাঁকরের ওপর।

—কত দেরী হবে সেপাই বাবা?

অনুকূল বুড়ীর প্রশ্নে তাকিয়েও দেখলো না। বুড়ী কিন্তু উসখুস করছে কথা বলার জন্যে।

—এই হাবাই হলো গোপীর ছেলে। আমার এই একটি নাতি।

অনুকূলের কানে ভোঁ ধরে গেছে তখন। রাবণের চিতার শব্দটা হু হু করছে। পালা জ্বরের মত হাত পায়ে জমাট ডিউটির জ্বালা ধরে গেছে!

—ছেলের মধ্যেও আমার ঐ একটি, গোপী।

এতক্ষণে কাক জেগেছে। ফর্সা হয়ে গেছে। দূরের পাঁচিলের গুমটির ওপর আলোগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে জলভরা চোখের মত। জেলের ভেতর ঘুম ভাঙানো বিউগল বেজে উঠেছে ভাঙ্গা গলায়। ফটক খুলে ঝাড়ু বালতি নিয়ে মেথরেরা বেরুচ্ছে একে একে। মোটর গাড়ী দুটো হর্ণ দিয়ে মোড় ফিরলো পাকুড় গাছের কাছে—বড় সড়কে।

অনুকূল শান্ত হয়ে দাঁড়ালো।

অনেকে এসে গেছে। লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে ওয়ার্ডারেরা। হাবিলদার এসেছে। কম্পাউণ্ডারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আর······।

খাটিয়ার ওপর শোয়ানো আছে, সাদা মলমলে ঢাকা গোপী দোসাদের লাস—মরা কুমীরের মত। বুড়ী খাটিয়া ছুঁয়ে বসে আছে। হাবা ঘুর ঘুর করছে এদিক ওদিক।

কুমীরের মত কেন? অনুকূলের মনে পড়লো ছেলেবেলায় দেখা মামাবাড়ীর ঘটনাটা। রূপনারায়ণের খালের একটা কুমীর তিল ক্ষেতে উঠে পড়েছিল ভুল করে। গাঁয়ের লোকেরা তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে এমনিভাবে সটান শুইয়ে রেখেছিল ক্ষেতের ওপর। আগুরিদের বিধবা ছোটবৌকে কিছুদিন আগে অনেক খুঁজেও পাওয়া যায় নি। নিশ্চয় তাকে খেয়েছে এই শালা কুমীর।

কম্পাউণ্ডার বললো—মিছেই এলি বুড়ী। লোকজন কৈ তোর? নিয়ে যাবি কি করে?

—জাতের কেউ এল না। রোগে তো আর মরে নি। রাজী হলো না কেউ ছুঁতে।

—কিছু টাকা খসালেই আসতো।

—তাও সেধেছিলাম। তবুও এল না।

একটু ভেবে নিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—কি জাত?

—রবিদাস বাবা!

—আচ্ছা, বার কর টাকা। এখুনি জাত যোগাড় করে দিচ্ছি।

বুড়ী কি যেন হাতড়াচ্ছে। আঁচলে ঢাকা থাকায় বোঝা যাচ্ছে না। হাবিলদার আর ওয়ার্ডারেরা এগিয়ে এল। সকলের চোখে যেন লালা ঝরে পড়ছে। দুটো মেথর কাজ ভুলে বসে পড়লো।

হাবিলদার কম্পাউণ্ডারের কানে কানে বললো—বেশ কিছু এনেছে বুড়ী।

—গ্যাংগের গোদা, কিছুতো রেখে গেছে নিশ্চয়।

কটা টাকা বের করতে বুড়ী দেরী করছে বড়। হয়তো তোড়ার গেরো খুলতে পারছে না। ওয়ার্ডারেরা অনুকূলের দিকে

আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে বললো—তুমি বাবা! ঐ দিকেই থাক। চুগলিবাজ!

কম্পাউণ্ডার বললো—নে বুড়ী, একটু জলদি কর।

—এই নাও। একটা ময়লা রূপোর হাঁসুলী বার করে সামনে ধরলো বুড়ী।

বুড়ী হাঁপাচ্ছে, গায়ের আঁচল পড়ে গিয়ে গলার দাগটা দেখা যাচ্ছে। হাঁসুলীটা খুলতে গিয়ে টানা হেঁচড়ায় ছড়ে গেছে খানিকটা।

অপ্রস্তুত হাবিলদারের গোঁফ ঝুলে পড়লো। বেকুবের মত কেঠো হাসি হেসে তাকালো কম্পাউণ্ডারের দিকে। মেথর দুটো মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—ওটা রেখে দে বুড়ী। ওতে কিছু হবে না।

সকলেই একটু নিঝুম হয়ে গেছে। হাবিলদার হঠাৎ গর্জ্জে উঠলো।
—আঃ, এই বুড়িয়া, হাত সরা শীগগির। চোখের সামনে কি করছে দেখ!

মলমল কাপড়ের ঢাকাটা একটু সরিয়ে গোপীর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল বুড়ী। ধমক খেয়ে হাত সরিয়ে নিল।

অনুকূলের পাহারা শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কি ভেবে সেও এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

কম্পাউণ্ডার ব্যস্ত হয়ে বললো—বিপদে ফেলেছে বুড়ী। লাস সরাবার নাম করে না। এইবার ভেপসে গন্ধ ছাড়বে। অগত্যা···

কম্পাউণ্ডার বিড়ি ধরিয়ে আরম্ভ করলো—তুমি তো শোননি অনুকূল গোঁসাই, কটা দিন কী উৎপাতই করলো এ ব্যাটা দোসাদ— আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ইস্!

বড় জমাদার—বড় ভারি ডাকু ছিল বুঝি ?

—ওরে বাবা ! ভাগ্যিস সেদিন মিলিটারীর গাড়ী পৌঁছে গেল সময় মত, নইলে প্রাণ নিয়েছিল সে যাত্রা। মহারাজগঞ্জের সড়ক ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরছি চাতরা থেকে। নদীর পুলটার কাছে এসে দেখি পথে পড়ে আছে তুটো গাড়োয়ানের লাস। টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছে। গাড়ীর আটা, ঘি সব লুটে নিয়ে গেছে। অর্দ্ধেক ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

ওয়ার্ডারেরা বললো—ও কি ভেবেছিল পৃথিবীটাকে ? আইন নেই ? সাজা নেই ? মালিক নেই ?

বিড়িতে জোরে টান দিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—সবচেয়ে তুঃখ হয়েছিল পুলের কাছে সেই মন্দিরটার দশা দেখে ! ক হাজার বছরের পুরনো মন্দির—জঙ্গলটাকে কত পবিত্র করে রেখেছিল। আজ পর্য্যন্ত কলেরা প্লেগ নদীপার হয়ে এদিকে আসতে পারে নি। সে ঐ মন্দিরের বিগ্রহের মহিমা। দেখলাম, এই মন্দিরের কপাট ভেঙে অমন সুন্দর নওলকিশোরের রূপোর চোখ তুটো উপড়ে নিয়ে গেছে।

—চণ্ডাল ! চণ্ডাল ! ফাঁসিতে কি হয়েছে ওর ? ওকে ধরে……। হাবিলদার বুড়ীর দিকে মারমূর্ত্তি হয়ে তাকালো !

কম্পাউণ্ডার—তারপর, লুট করবি তো কর, গরুর গাড়ী তুটোতে আগুন লাগালি কেন ? আমরা যখন পৌঁছেছি, তখন একটা গরু ঝলসে মরেই গেছে আর বাকীগুলো ছটফট করছে তখনো !

ওয়ার্ডারেরা এক সঙ্গে প্রায় ক্ষেপে চেঁচিয়ে উঠলো—মুতে দাও পাপীর লাসের ওপর। কুকুর দিয়ে মুতিয়ে দাও।

কম্পাউণ্ডারের বিড়ি শেষ হয়েছে।—কিন্তু বাবা, পলাইতে পথ—মাই যম আছে পিছে। এখন টের তো পেলে ? দাঁড়কাকে ঠুকরে খাবে যে এইবার ?

হঠাৎ পচা মহুয়ার গন্ধে বাতাসটা সিঁটকে উঠলো। টলতে টলতে আসছে হরি—ফাঁসিঘরের ডোম। হাতে একটা বড় মেটে সাবান, কোমরে নতুন তোয়ালে জড়ানো।

—একি? বেড়ে সব বসে বসে শবসাধনা করছ! লাস সরে নি এখনো। বড় সাহেবের জুতোর ঠোকর আছে কপালে।

একজন ওয়ার্ডার বললো—হরিয়া, ঐ দেখ।

—কি?

আর একজন ওয়ার্ডার আঙুল তুলে হাবাকে দেখিয়ে দিল।

হরি—ওটা কে?

কম্পাউণ্ডার—গোকুলে বাড়িছে যে!

বড় জমাদার—গোপী ডাকুর ছেলে।

হাবা নিজের মনে কাঁকর নিয়ে খেলছিল। হরি ডোম হাততালি দিয়ে আদর করে ডাকলো—আয়! আয়! আয় বেটা মেরা।

হাবা দৌড়ে এসে হরির কোলের ওপর লাফিয়ে চড়ে বসলো। হাবার ধূলোমাখা পাছাটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে হরি বললো—জলদি বড় হ বেটা। আমার পেন্সনের সময় হয়ে আসছে। তোকেই বসিয়ে যাব আমার গদিতে। আর তো উপযুক্ত কাউকে দেখছি না।

কারু মনে নেই যে অনুকূল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনুকূল—চোখের তারা দুটো তার পাথর হয়ে গেছে যেন।

কম্পাউণ্ডার অনুকূলকে আড় চোখে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বুড়ীকে প্রশ্ন করলো।

—তোর গোপী এ পথে এল কেন বুড়ী? সামলাতে পারিস নি?

আপত্তি করলো হরি—কেন মিছে, গল্প জমাচ্ছ কম্পাউণ্ডারবাবু।

ডাকাতের গল্প। সকলে শুনতে চায় সেই রক্তবীজের কাহিনী—মহারাজগঞ্জের জঙ্গলের নরশার্দ্দূল। লুট, রাহাজানি, নরহত্যার নির্ভীক অবতার গোপী দোসাদের গল্প। এখনও কুয়াসা সরে নি। পৃথিবী জাগে নি। শেষ ঘুমের দুঃস্বপ্নের মত শোনাবে ডাকাতের জীবন কথা।

—বল বুড়ী বল! ওয়ার্ডারেরা সকলেই উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব হয়ে হুকুম জানালো।

বুড়ী আরম্ভ করলো—ছেলেবেলা থেকেই বড় পেটুক ছিল আমার গোপী।

হেসে উঠলো সকলে—এই সেরেছে! ভারি কথা শোনালে। পেটুক কে না পৃথিবীতে? তা বলে সবাই তো আর ডাকাত হয় না বুড়ী।

—ছেলেবেলাতেই একবার চিলের মাংস খেয়ে কলেরা হয়েছিল গোপীর। সে যাত্রা ভগবান বাঁচিয়ে দেয়।

আরও জোরে হাসির হর্‌রা উঠলো।—হাঁ এইবার বলেছে বটে। ডাকাতের ছেলেবেলা—চিলের মাংস খাবে, পিশাচে পাবে, তবে তো।

—হ্যাঁ বাবা, সত্যই একবার পিশাচে পেয়ে ছিল ওকে! ওঝা ডাকিয়ে অনেক ঝাড়ালাম। কিছুই হলো না। গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেল গঞ্জে।

হাবিলদার—চাকরী করতে না চুরী করতে?

—ভিক্ষে করতে। সমস্তদিন হালুইকরের দোকানে ঠোঙা কুড়িয়ে খেত। পুরি মেঠাই খেয়ে খেয়ে জিভ বড় হয়ে গেল, আর কি ঘরে ফেরে।

কম্পাউণ্ডার—তারপর?

—শেষে ক'বছর পরে, খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে দামড়া হয়েছে যখন, তখন বিয়ের লোভে ঘরে এল একদিন। হাবার মা যখন এল তখন সে এইটুকু। ঐটুকু মেয়েই ধুচুনী বেচে ছোঁড়াকে খাইয়েছে, কত সেবা করেছে। আর হতভাগা……।

রাগে অভিমানে বুড়ীর গলার স্বর চেপে এল।—হতভাগা দিনরাত ঠেঙিয়েছে বৌকে। সন্দেহ করে লোহা তাতিয়ে ছেঁকা দিয়েছে। বউ শেষে ঘরের বার হওয়া বন্ধ করলো।

বড় জমাদার—তার পরেই বুঝি ডাকাতি ধরলো।

—না লেঠেলি। মোহান্তদের লেঠেল হলো গোপী।

কম্পাউণ্ডারের চোখে হঠাৎ প্রবল একটা উৎসাহ কিলবিল করে উঠলো।—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে। সেই ফৌজদারী মামলা—সিমেণ্টের খাদ নিয়ে মোহান্ত আর চৌধুরীবাবুদের ফৌজদারী। এ পক্ষে দোসাদ লেঠেল ওপক্ষে জংলী মাঝি। বরাকরের দহে কত লাস গুম হলো। তিন বছর ধরে মামলা। পাটনাই ব্যারিষ্টারের দল সওয়াল জেরায় গরমে দিল আদালত। দেড় শো সাক্ষী, ন লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু আলবৎ মোহান্তদের মোচ! মরদের মোচ বলতে হবে। টাকার দরিয়া বইয়ে দিল—একটা লোককেও আইনে গাঁথতে পারলো না। লেঠেলদের কজনের দু'চার মাসের কয়েদ হলো শুধু।

—হাঁ, আমার গোপীরও ছ'মাস হয়েছিল।

হাবিলদার—হুঁ বুঝলাম, তখন থেকেই গোপী তোমার হাত পাকিয়েছে।

বুড়ী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ওয়ার্ডারেরা বললো—থামছিস কেন? বলে যা। পাপীর কাহিনী রামায়ণেও আছে, শুনতে দোষ কি!

—জেল থেকে ফিরে গোপী চাকরী নিল। তিলিদের কাঠের

গোলায় করাত টানতো। দু'আনা করে পেতও রোজ। কিন্তু ছেলে-বেলার সেই পেটুকে দোষ, খাই খাই আর বদমেজাজ। আজ আচার নেই কেন, কাল তরকারী নেই কেন। মার খেয়ে খেয়ে হাড় মাটী হয়ে যেত বউয়ের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বুড়ী একবার হাবাকে খুঁজলো।—হাবা তখন হয়েছে। বউ গঞ্জে গিয়ে ভিক্ষে খাটতে আরম্ভ করলো।

কম্পাউণ্ডার—ভিক্ষে কেন? আগে না কুলো ধুচুনী বেচতো!

—না, ধুচুনী আর বেচতো না। বুড়ী একটু আমতা আমতা করে বললো।

—একদিন ভিক্ষে থেকে সমস্ত রাত ঘরে না ফিরে বউ এল পরদিন সকালবেলা। গোপী টাঙি নিয়ে কাটতে গেল বৌকে। আমি বুড়ো মানুষ, কতই বা গায়ের জোর। তবু গোপীর হাতের টাঙি ধরে ঝুলে রইলাম। বৌকে বললাম—পালিয়ে যা, ঠেঁটা বৌ তবু পালালো না।

এখনও পৃথিবীর ঘুম ভাঙে নি। কার্ত্তিকের ভরাট কুয়াশার আবছায়ায় ডাকাতের টাঙি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। গল্প জমে উঠেছে এইবার। এই তো রক্তাক্ত উপসংহারের আরম্ভ! শ্রোতার দল রুদ্ধ নিশ্বাসে চুপ করে বসে শুনতে লাগলো।

—কিন্তু গোপীকে আটকাতে পারলাম না। আমারও চোখে পড়লো, বউ ধর্ম্ম খারাপ করে এসেছে। চেহারা দেখেই সব বুঝে ফেললাম। মূর্চ্ছা গেলাম আমি।

বুড়ী ঢোঁক গিলে চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে রইল। মূর্চ্ছার মতই মনে হলো।

হাবিলদার চেঁচিয়ে বললো—এই বুড়িয়া সামলে।

—চোখ খুলে বুড়ী আরম্ভ করলো—জেগে উঠে দেখি, কাটামড়া বউয়ের বুকে চড়ে হাবা মাঁই খাচ্ছে। গোপী পালিয়েছে।

এতক্ষণে বুড়ীর শুকনো খটখটে চোখে জল দেখা দিল। চোখে আঁচল দিল বুড়ী।

—তারপর? এ প্রশ্ন আর এল না কারুর মুখে। সকলের সব কৌতূহলের যেন ক্ষান্তি হয়ে গেছে।

হরি ডোম দেয়ালে ঠেস দিয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে—নাক ডাকছে ঘড় ঘড় করে। হাবিলদার অন্যদিকে তাকিয়ে খৈনির ডিবে বার করলো। ওয়ার্ডারেরা গম্ভীর মুখে বুড়ীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কম্পাউণ্ডার একটু বিমর্ষ, নিজের মনে কি ভাবছে। এই স্তব্ধতার মাঝখানে শুধু হাবাই লাফালাফি করছে কাঁকর নিয়ে। এই ক্লিন্ন ইতিহাসের কবল থেকে হাবাই যেন একটু ছিট্‌কে সরে রয়েছে দূরে।

কম্পাউণ্ডার ভাবছে গোপীর টাঙির কথা। কী নিদারুণ সে টাঙি। মহারাজগঞ্জের জঙ্গলের গাড়োয়ানের আর হাবার মা'র গলায় পড়েছে তার কোপ। গোপী যেন তার ভাগ্যকে কুপিয়ে বেড়িয়েছে, ক্ষ্যপা কাঠুরিয়ার মত।

কসুর আর সাজা! সাজা আর কসুর!

অনুকূলের দিকে তাকালো কম্পাউণ্ডার।

অনুকূলের চোখের পাতা ঢুলে পড়েছে ভারি হয়ে। পরম রুদ্র অনুকূলের চেহারাই এ নয়। ধ্যানী শিবের মত স্থিরসুন্দর। অপরাধী পৃথিবীর ঐ গলিত অন্ধকারের নির্মোক বুঝি খসে গেছে তার চোখে।... এখান থেকে এই সড়ক ধরে, পুষ্পিত শাল মহুয়ার জঙ্গল ছাড়িয়ে—গেরুয়া পলিপড়া দামোদর। সুসর্পিল চুটুপালুর পাহাড়ী ঘাট—রাঁচীর মেঘরঙা গিরিমালার ভীড়। তারপর পুরুলিয়া রোড

দুপাশে ধানক্ষেত, লাক্ষাচষা, কুলের জঙ্গল—ঝালদা। সহে স্নিগ্ধ, যন্ত্রণায় উজ্জ্বল, আলোয় আলোকিত, সুচির শ্যাম পৃথিবী।

খাটিয়ার দিকে তাকালো অনুকুল।—না মরা কুমীর নয়। লড়াইয়ে ঘায়েল জবরদস্ত এক সেপাইয়ের লাস, সাদা কফনে ঢাকা। জঙ্গ বাহাদুর গোপী। নাই বা বাজলো বিউগল্, নাই বা বাজলো ড্রাম। কোন বিলাপ গাইতে হবে না ব্যাগপাইপে। কাতার বেঁধে সেপাইরা বিদায় দেবে না গোপীকে। রাইফেল তুলে আকাশে শোকের শট দাগবার দরকার নেই। কোন আওয়াজ হবে না গোপীর ফিউনারালে।

—ঐ বড় ঝিলের উত্তরে। সোনালী রোদের ছিটে লেগেছে এখন ফণীমোরব্বার বনে। সেইখানে এক জায়গায়, অজস্র শান্ত মাটীর ধূলো দিয়ে চাপা দিতে হবে গোপীকে।

খাট্টিয়ার পায়াতে ঠোকর দিয়ে দাঁড়ালেন জেলার বাবু।

—ডিসপার্স্। বেকুব সব। লাস হঠাও এক্ষুনি। ডোম বোলাও।

ঝুপ করে রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো অনুকূল। এগিয়ে এসে খাটিয়ার একটা ধার তুলে ধরে বুড়ীকে বললো—উঠাও!

বুড়ী কাঁদ কাঁদ হয়ে বললো—সে কি বাবা, আমি একা কি করে পারি। তার চেয়ে বরং যা খুশী।……

—ওঠাও। অনুকূল যেন ধমক দিল।

—এ কি? এ কি? সকলে একসঙ্গে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

হাবিলদার—এ অনুকূল, পাগল হলে না কি?

কম্পাউণ্ডার—আরে গোঁসাই, চাকরীর ভয় নেই? তোমার ডিউটী শেষ হয় নি এখনও।

বড় জমাদার—এ অনুকূল, উর্দী ছেড়ে নাও, এ কি করছো তুমি ?

ততক্ষণে গোপীর খাটিয়ার এক দিকটা তুলে অনুকূল তার ঘাড়ের পেছনে চড়িয়ে ফেলেছে। অপর দিকটা বুড়ীর মাথার ওপর। লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে, ফটক ছেড়ে বিশ গজ চলে গেছে তারা।

পাকুড় গাছটা পার হয়ে বড় সড়কের ওপর এসে ওরা উঠলো। হাবা সমান তালে পা ফেলতে পারছে না, পেছনে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে। ঝিলের দিকে মোড় ফিরতে পথের একটা ঘুমন্ত খেঁকী কুকুর জেগে উঠে উৎসাহে লেজ নেড়ে ওদের সঙ্গ নিল।

অনুকূলের রাইফেলটা তুলে নিয়ে হাবিলদার কম্পাউণ্ডারকে ফিস ফিস করে বললো—ডিসমিস্ !

কম্পাউণ্ডার—তবুও ভাল, জেল যেন না হয়।

গ্লানিহর

হিরোতা মারু পোতাশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে এসে এবার ডাইনে মোড় নিল। ধীরে মিলিয়ে গেল এপোলো বন্দরের অভ্রলেহী টাওয়ার আর ঠাসাঠাসি নোঙর করা কার্গোবোটের মাস্তুলের ভীড়। নিস্তরঙ্গ আরব সমুদ্রের বুক চিরে হিরোতা মারু চলল ক্ষুব্ধ সিন্ধুঘোটকের মত সাঁতার দিয়ে—তার সধূম প্রশ্বাসবায়ু মেঘের মত উড়ে গিয়ে এলিফাণ্টা পাহাড়ের ছোট চূড়োটাকে ধরল ঘিরে। বোম্বাইয়ের মাথার ওপর তার ঘনমসী কালো ধোঁয়ার সুগোল মারাঠী টুপিটা শুধু সুস্থির হয়ে লেগে রইল উত্তরের আকাশে।

ঠিক এমনি সময়ে হাঁ করে এই আকাশ ভুবনের খেলা দেখাটা যে কত বড় মূঢ়তা, তা টের পেলাম ডেকের ওপর দৃষ্টি পড়তে। শোনপুরের মেলার একটা ভগ্নাংশ যেন—এত ভীড়। এরি মধ্যে বিছানা বিছিয়ে যে যার যায়গা কায়েমী করে নিয়েছে। বাক্স তোরঙ্গ বদনা ছড়িয়ে চৌহদ্দি রেখেছে পাকা করে। স্থান নেই। কিন্তু স্থান চাই, শুতে হবে। এডেন পৌছতে পুরো ছটি দিন; ঠায় দাঁড়িয়ে তো আর যাওয়া যায় না।

কাথিয়াবাড়ী বেনেরা তাদের ছেঁড়া জুতোগুলো পর্য্যন্ত দুহাত অন্তর এলোপাথাড়ি করে সাজিয়ে রেখেছে—যতদূর পারে দখলের পরিধি রেখেছে ফলিয়ে। মূর্ত্তিমান স্বার্থোন্মাদ সব, ক্ষুরের মতন শান দেওয়া সওদাগরী বুদ্ধি, শত অনুরোধেও কোন ফল হবে না।

জাঞ্জিবারী বোরারা চলেছে। লবঙ্গ বেচা টাকায় লাল লাল চেহার

প্রত্যেকের দুটী করে বিছানা, একটি শোবার আর একটি নেমাজ পড়বার। সামনে দাঁড়িয়ে মূর্চ্ছা গেলেও এরা আধ হাত জায়গা ছেড়ে দেবে না। আমারি মত নিরুপায় এক পালেস্তানী ইহুদী সাহেব অগত্যা তার স্যুটকেসটার ওপরেই বিছানা পেতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আমি কি করি ?

নজরে পড়ল ডেকের শেষ প্রান্তে খাঁচার মত মুখোমুখি দুটো বেশ সুপরিসর কাঠের ঘর, ওপরে নোটিশ লেখা—For horses only ; শুধু ঘোড়ারা থাকিবে। এখন কিন্তু ঘোড়ারা নেই, ফিরতি পথে রেসের ঘোড়া যাবে। বাক্স বিছানা সমেত একটা খাঁচায় ঢুকে পড়লাম। দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজের কোরিয়ান মেথরটা আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে আপত্তি করতেই একটা সিগারেট উপহার দিলাম। খুশী হয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় খাঁচাটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই বিস্মিত হতে হল। সপরিবারে এক বাঙালী ভদ্রলোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছোট ছোট ছেলে—একটি বছর পাঁচেক আর একটি দুগ্ধপোষ্য, মাত্র হামা দেবার বয়সে পৌছেছে। খুশী হলাম দেখে। বাঙালী সহযাত্রী, তবু মনের সুখে বাঙলা বলা যাবে—দিন যাবে ভাল ভাল। তা ছাড়া একজোড়া বাঙালী খোকা, জাহাজী জীবনে ক্বচিৎ এমন ষোল আনা স্বদেশী সঙ্গ মেলে।

কিন্তু বড় নিরাশ হতে হল। অবাক হলাম ভদ্রলোকের সৌজন্যবোধের অভাব দেখে। এঁদের দিকে এগিয়ে যেতে ভদ্রলোক চকিতে একবার দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। ভদ্রমহিলা ঘোমটা টেনে কাঠের সিন্ধুকটার আড়ালে গিয়ে বসলেন। সাগ্রহ আলাপনের উৎসাহটা উদ্যোগেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। নিজের খাঁচায় ফিরে এলাম ক্ষুণ্ণ হয়ে।

শুয়ে শুয়ে দেখছি মহিলাটি ষ্টোভ জ্বেলে খিচুড়ী রাঁধলেন। ভদ্রলোক আর বড় ছেলেটা খেয়ে নিল। শিশি থেকে গুঁড়ো দুধ বার করে নিয়ে জ্বাল দিলেন—ছোট ছেলেটাকে খাওয়ান হল। ভদ্রলোক সিগারেট মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলেন। মহিলাটিও খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে তোরঙ্গ থেকে কাঁথা বার করে সেলাইয়ের কাজে মন দিলেন।

বিকেলের দিকে জাহাজের দোলা বেড়ে ওঠায় ঘুম গেল ভেঙে। চোখ বুজেই শুনছি মাথার কাছে কুর কুর একটা শব্দ। চেয়ে দেখি বড় ছেলেটা আমারি মাথার কাছে বিছানার কোণে বসে এক বাটি গরম কফি নিয়ে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মিছরি চিবোচ্ছে সশব্দে। ছোট ছেলেটাও মেঝের ওপর বসে একটা খালি সিগারেটের কৌটো নিয়ে দুহাত দিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ছে। বড় ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম—কি খোকা, নাম কি তোমার ?

—পটল।

—ও তোমার কে হয় ?

—আমার ভাই পন্টু।

—আর ওঁরা কারা ? বাবা আর মা ?

—হাঁ।

—কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

—আমরা যাচ্ছি কেপ।

—তোমার বাবা বুঝি সেখানে চাকরী করেন ?

—হাঁ।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল পটল। এবার তার পালা। প্রশ্ন করল—তুমি কে ?

—আমিও চাকরী করি। যাচ্ছি এডেন।

—তোমাকে কে রান্না করে দেয় ?

—আমি হোটেল থেকে খাবার কিনে খাই।

—তবে তোমাকে হাওয়া করে কে ? যখন কাশি হয় ?

পটলের প্রশ্নে কৌতুক আর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বাবার বুঝি খুব কাশি হয় ?

—হাঁ, হাঁপানি কাশি। কাউকে বলবেন না কিন্তু।

—কেন বল ত ?···পটলের কথাবার্ত্তা ধাঁধার মত ঠেকছে।

—জাহাজের ডাক্তার আমাদের নামিয়ে দেবে তা হ'লে।······পটল উত্তর দিল।

এইবার বুঝলাম। ছেলেটির বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। দেখলাম আলাপের সঙ্গী হিসেবে পটল নেহাৎ নগণ্য নয়। এ বিষয়ে বাপের চেয়েও ঢের বেশী শালীনতার পরিচয় দিয়েছে সে।

প্রশ্ন করলাম—তোমার বাবার নাম কি ?

—বিকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

—তোমাদের বাড়ী কোথায় পটলবাবু ?

—কিম্বার্লি।

—আর মামাবাড়ী ?

পটল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল—ইণ্ডিয়া। আমার প্রশ্ন-প্রবাহে বাধা পড়ল। এ সব আবার কি বলে। বাড়ী কিম্বার্লি, মামাবাড়ী ইণ্ডিয়া ? মনে মনে বিচার করে দেখলাম—তাই হবে বোধ হয়। বেচারা গাঙ্গুলী হয়ত বহুদিন দেশ ছাড়া। পেটের দায়ে পড়েছে গিয়ে সুদূর কিম্বার্লি।

এবার নজরে পড়ল ছোটটার ওপর। ডাকলাম—পণ্টু। ছেলেটা দ্রুত হামা দিয়ে চলে এল। পটল চেঁচিয়ে উঠল—বিছানায় বসাবেন

না, মুতে দেবে। এই বলে সে পন্টুকে সবলে দুহাত দিয়ে ধরে বুকের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে বেতালা পা ফেলে চলে গেল।

পটলের মা যে আধুনিকা নন তা বুঝতে দেরী হয় না। মাথার ঐ ঘোমটাটিই তার প্রমাণ। তবে তিনি সাহসিকা নিশ্চয়ই। দুটি শিশু সন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দূর কিম্বার্লিতে গিয়ে সুখে ঘর করছেন—বাঙলার ছায়াসুনিবিড় পল্লীর একটুকরো সংসার কৃষ্ণ মহাদেশের কোলে এক মরু উপত্যকায় ছিটকে গিয়ে পড়েছে।

খাওয়া শোওয়ার সময়টুকু ছাড়া পটল আর পন্টু সব সময় আমারই আশে পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। পন্টু এক একবার ক্লান্ত হয়ে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে—বিছানায় তুলে নিই। পটল তার মায়ের ইসারা পেয়ে কখনও কখনও চলে যায়—ডেকের দোকান থেকে সোডা দেশলাই সিগারেট কিনে আনে। দুপুরে যখন মহিলাটি গাঙ্গুলী মশাইয়ের সঙ্গে স্নানাগারের দিকে যান, পটল তখন বসে বসে জিনিষ-পত্র পাহারা দেয়, পন্টুর ওপর চোখ রাখে।

দিন কাটছিল। আর কটাই বা দিন? গাঙ্গুলীর অসামাজিকতায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম সত্যি কিন্তু পটল আর পন্টু সে ত্রুটী ভালভাবেই মিটিয়ে দিচ্ছে। দিবারাত্র সমুদ্রের একটানা কলোচ্ছ্বাস; কাণ ও মন দুই বধির হয়ে যায়। পন্টু ও পটল আচমকা এসে মিঠে কলরব জাগিয়ে তোলে। একটু স্বজনতা পাই, তাতেই মন ভরে ওঠে।

পটল ছেলেটা বড় কাজের। খিচুড়ী রান্না থেকে বিছানা করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। ভাবছি এত বুদ্ধিমান ছেলেটা, লেখাপড়া শিখছে তো? নইলে হয়তো কপালে

কুলিগিরি আছে। যে সাংঘাতিক দেশে থাকে! পটল এসে ডাকল—মিষ্টার কি করছ? জিজ্ঞাসা করলাম—পটলবাবু তুমি লেখাপড়া কর না?

—হাঁ, আমি আর মা পড়ি।

—কে পড়ায়?

—বাবা। পন্টুও পড়বে আর একটু বড় হলে।

চুপ করে এদের কথাই ভাবছি। গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। পটলের সঙ্গে এমনি ধরণের খণ্ড আলাপের ভেতর দিয়ে তাদের পরিচয়টা ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

পটল বলল—জান মিষ্টার, আমি বিলাত যাব পড়তে। বাবা বলেছে। বললাম—তাই নাকি? বেশ বেশ, নিশ্চয়ই যেও পটলবাবু। পটল আবার বলল—আমার বিয়ে হবে মেমের সঙ্গে, মা বলেছে। লজ্জিত হয়ে পটল বালিশে মুখ গুঁজে রইল।

আদর করে পটলের মাথাটা ঝেঁকে দিয়ে বললাম—বিয়ের সময় আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। পটল একটু সিরিয়াস হয়ে সাগ্রহে বলল—তবে তোমার নাম লিখে দিয়ে যাও। চিঠি দেব।

নাম লিখে দিতে হ'ল।

গাঙ্গুলী তার নিত্যকার নিয়ম মত বৈকালীন ভ্রমণের জন্য ওপরের ডেকে উঠে গেলেন। আমিও উঠব উঠব করছি। মহিলাটী বালতিতে খিচুড়ীর চাল ধুচ্ছেন—মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে।

দেখছি। স্থির দৃষ্টি নিয়ে দেখছি ঐ মহিলাটীকে। মহিলা? মিসেস গাঙ্গুলী? পটলের মা?

চোখ দুটোকে লোহার শিক দিয়ে কে যেন নির্মমভাবে খুঁচিয়ে দিল। এ তো মহিলা টহিলা নয়! এ যে আমাদের ভৈরব মালীর মেয়ে মালতী।

এই মালতী, যে জেঠামশায়ের বাড়ীর ঝি ছিল। কথাবার্ত্তা নেই হঠাৎ জেঠীমার গয়না চুরি করে পালাল, শিশির বেয়ারার সঙ্গে। ধরা পড়ে জেলে গেল। ফিরে এসে ঘর নিল কাশীর এক কুখ্যাত পাড়ায়। তার প্রণয়াস্পদ শিশির বেয়ারা তারই হাতে খুন হল একদিন। তারপর থেকে সে ফেরার। পুলিশ এতদিন খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পায় নি।·· ···সব জানি। আমি ওর সাক্ষাৎ চিত্রগুপ্ত! ওর পাপ জীবনের সমস্ত তালিকা আমার কাছে গচ্ছিত।

এখন বুঝেছি ঐ আধ হাত ঘোমটার অর্থ। ছি ছি, একেই এতদিন মনে মনে এত স্তুতি করে এসেছি। ঘটনার পাকে এত বড় ব্যঙ্গ লুকিয়েছিল প্রহেলিকার মত!

গয়নার শোকে জেঠীমার বুকফাটা চীৎকার শুনতে পাচ্ছি। ডাকব পুলিশ। আমি শুধু ওর চিত্রগুপ্ত নই, আমি এবার ওর যম।

···সোজা জিজ্ঞেস করব—ভাল চাস তো মাগি জেঠীমার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দে। তা হ'লে ছেড়ে দেব, নইলে রেহাই নেই।

···আরো জানবার আছে। সুস্পষ্ট উত্তর চাই—শিশিরকে খুন করল কেন? গাঙ্গুলির সঙ্গে কতদিন আছে?

···না হয় একবার সামনে আসুক। ক্ষমা চা'ক, অকপটভাবে স্বীকার করুক অপরাধ। তারপর বিচার করা যাবে ছেড়ে দেওয়া যায় কি না।

···কানটা ধরে একবার জিজ্ঞেস করলে হয়—এখনো পিরিতের ব্যবসা ছাড়তে পারলি না। গাঙ্গুলির কাঁচা মাথাটা না খেলে আর চলছিল না। কেন? সন্ন্যাসিনী হতে পারিস নি—বৃন্দাবন-টন গিয়ে।

অনেক কিছুই বলবার ছিল কিন্তু বলা আর হ'ল না আজ। একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচে মনের সমস্ত উদ্ধত বাচালতা স্তব্ধ হয় গেল।

কিন্তু বলতেই হবে।

কিংকর্ত্তব্য গুলিয়ে গেল। একট প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম পণ্টু তার অর্দ্ধভুক্ত বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে বসে বসে আমার বিছানাটাকে নোংরা করছে। একটান মেরে নামিয়ে দিলাম—যা এখান থেকে এক্ষুনি চলে যা।

পটল ছবির বই দেখছিল। বললাম—এই ছোঁড়া, ভাগ্ হিঁয়াসে। আর আসিস না।

পটল ও পণ্টু চলে গেল।

··গাঙ্গুলীকে ডেকে একবার সাবধান করে দেব। ওর ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠছি। না হয় রক্ষিতাই রেখেছে কিন্তু ইডিয়টটা কি আর কাউকে পায় নি! এমন একটা বিষকন্যাকে করেছে সহচরী। এর একটী ছোবলে যে গরল উগরে আসবে তাতে কয়টি মুহূর্ত টিকে থাকবে ওর সংসারবিলাস!

···শিশির বেয়ারা ঘটিত কাহিনীটা শুনিয়ে দেব, তাতেও যদি মূর্খ লোকটার হুঁস হয়। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে ওকে বলেও কোন সুফল হবে কি? এই গাঙ্গুলীই হয়তো একটী রসাতলচারী নররূপী সরীসৃপ। জেনে শুনেই কাল নাগিনীর সঙ্গে এক বিবরে বাসা বেঁধেছে।

···নাঃ, কিছু একটা করতে হবে। এই পুংশ্চলী নারীটার এত নিখুঁত সাবিত্রীব্রতের অভিনয় আর সহ্য হয় না।

•

পটল আর পণ্টু এদিকে আর আসে না। নিশ্চিন্ত হলাম। আর যেন না আসে। এখন কি করা কর্ত্তব্য সেইটাই ভাবি।

...যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। দুজনকেই ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলব—আর যেন ভবিষ্যতে কোন কেলেঙ্কারী না করে। যেন দুজনে মিলে মিশে ভালভাবে থাকে। আর ছেলে দুটোকে যেন আর্য্য-সমাজের অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয় যাতে ভবিষ্যতে মানুষ হতে পারে।

মাথার কাছে খস খস একটা শব্দ হতে তাকিয়ে দেখি পটল এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিনের মত বিছানা ঘেঁসে নয়—একটু দূরে। তাকাতেই বলল—মিস্টার তুমি আমাদের মারবে কেন?

—কে বলেছে আমি তোদের মারব?

—হাঁ, মা বলেছে, তোমার কাছে গেলে তুমি মারবে। বড় পাকা পাকা শোনাল ছেলেটার কথা বললাম।—যা নিজের জায়গায় যা, চট্ চট্ করিস না এখানে।

পটল, পল্টু নিজেদেরই বিছানায় বসে সারাদিন খেলে, আবোল তাবোল বকে, খায় আর ঘুমোয়। মালতীর মাথায় এই কদিন আর ঘোমটার বালাই নেই। এ দৃশ্য দেখি, চক্ষু পোড়ে, অন্তর্দাহও হয়।

...আজই তলব করব দুজনকে। শেষ সাবধান বাণী শুনিয়ে, প্রতিজ্ঞা করিয়ে, ছেড়ে দেব।

পটল অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে বলল—মিস্টার তোমার দেশলাইটা দাও তো। স্টোভ জ্বালতে হবে শিগগির দাও। পটলের মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম—কেন পটল কি হয়েছে? অত হাঁপাচ্ছ কেন?

—তেল কর্পূর গরম করব। বাবার হাঁপানি ধরেছে, বুক ব্যথা করছে।

দেখলাম গাঙ্গুলী মশায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছেন। সাঁ সাঁ করে হাঁপাচ্ছেন বুকে হাত রেখে। মালতী একহাতে তাঁর বুকে হাত বুলোচ্ছে অপর হাতে করছে পাখার বাতাস।

পটল স্টোভ ধরিয়ে একটা বাটিতে তেল কর্পূর চড়িয়ে দিল।

ওদিকে আমার কিছু করবার নেই। ভাজা কর্পূরের সুগন্ধ ভেসে আসছে। পন্টু সবেগে হামা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল্। এর সঙ্গেও আজ আমার কোন কাজ নেই।

হাঁপানির জোর বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ। এবার সাঁ সাঁ শব্দ ছেড়ে দস্তুর মত আর্ত্তনাদ সুরু হ'ল। মালতী গাঙ্গুলীর পায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চুপ করে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। জল আর আকাশের নীলঘন রূপ ফিকে হয়ে এসেছে। এডেন বোধ হয় আর বেশী দূর নয়।

শেষ কথাটা শুনিয়ে দিয়ে নেমে পড়তে হবে। কিন্তু কখন বলি?

পটল আস্তে আস্তে এসে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল—ডাক্তারকে বলে দিও না মিষ্টার। আমাদের নামিয়ে দিলে খুব কষ্ট হবে, বুঝলে?

কর্ত্তব্য আর স্থির হ'ল না। একটা অলক্ষ্য ভীরুতা এসে শেষ কথাটাকেও একেবারে চাপা দিয়ে দিল—বলা আর হ'ল না।

ভাবছি পটল ও পন্টু। বড় হবে বিলেত যাবে। মেম বিয়ে করবে। এদের জীবনশোণিত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে মহামানবের সহস্র স্রোতে।

ভাবছি—মালতী আর গাঙ্গুলী। কোথায় তারা? আদিম নীহারিকার মত সব অন্ধকারের বোঝা নিয়ে তারা মুছে গেছে অনেক দিন। আজ যাদের দেখছি তারা আর কেউ নয়।—তারা শুধু পটলের মা আর পটলের বাবা।

চিন্তার আবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুখতন্দ্রা ধীরে নেমে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠতে হল—শিশুর আক্রমনে। পল্টু তার দন্তহীন মাড়ি দিয়ে কামড়ে ধরেছে আমার নাক ; তার মুখের লালায় আমার সমস্ত মুখ প্রলিপ্ত করে তুলেছে।

তুলতুলে কচি মানুষের মুখ, জেলির মত নরম ঠোঁট। নতুন মানুষের গন্ধ পাচ্ছি পল্টুর দুধে মুখে। পল্টুকে বুকের ওপর তুলে নিলাম।

এডেনের গ্যারিসন আর কয়লার স্তূপ দেখা যাচ্ছে। যাত্রীদের কোলাহল শুনছি—এডেন এডেন। এডেন এসে পড়েছে।

মনে পড়ল আমাকেও নামতে হবে, কিন্তু পল্টু তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার বুকের ওপর—সুখসুপ্ত মানুষের ভবিষ্যৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

পল্টুর ঘুম ভাঙাতে হবে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো!

কিন্তু বাধা আছে—সুকুমারের ব্রহ্মচর্য্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ আর কপনি ধরেছে সে। আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে শুধু কখানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের পুকুরঘাটে নির্জ্জন দুপুর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎ স্পর্শ—শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে কে যেন বলছে—মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস্ এই এগজামিনটা পর্য্যন্ত। তারপর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার বলতেন—প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভাল জিনিষ পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক—এ সব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম!

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোট বোন রাণু আর ঝি। তাদের মন প্রবোধ মানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাস ডাক্তারকে—যত শীগগি্র পার পাত্রী ঠিক করে ফেল। আর দেরী নয়। ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে,—ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও এমন কসাইপনা কেউ করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু স্বকুমারের মতিগতির চার্জ্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু স্বকুমারকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু স্বকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই করালেন।—নাও সই কর। মুন্সেফী চাকরী, ঠাট্টা নয়। সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনক রাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ীর বিষণ্ণ আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা স্বকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন—কিছু ভাববার নেই; সব হো যায়গা।

সংসারের ওপর স্বকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায় নি ঠিকই। তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ একআধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একদিন পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে স্বকুমারের একটা বচসা। বাড়ীর সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে স্বকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে।

জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে তাকে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হয় বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

স্নকুমার বললো—আপনাকে এবার ওয়ার্ণিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন—আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রের দিব্যি। তা ছাড়া ভাল ছবি—ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেণ্ট বোধ হয় সার্থক হয়ে উঠছে। স্নকুমার কাব্য পড়ে, কবার আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমায় যায়। এদিকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নি। আজকাল স্নকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবু ফুলের স্নগন্ধে মনটা অকারণেই উড়ে চলে যায়—ধূলিধূসর সংসারের বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। একটা বিষণ্ণ স্নখকর বেদনা। কিসের অভাব! কাকে যেন চাই! কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় স্নকুমার।

রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরবার পথে কানাইবাবু স্নকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো—কানাইবাবু!

—কি?

—মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—নিশ্চয়। কালই চল বারাসত। যাদব বোসের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন।—ভাল করে দেখে নে সুকু। মনে যেন শেষে কোন খুঁত খুঁত না থাকে।

উকীলের মুহুরী যাদব বোস। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব বোস অল্পপণে দয়ালু সৎপাত্র খুঁজছেন।

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে। বিরাট একটা ঝকঝকে বেনারসী সাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছে ধার করা চুড়ি, রুলি, বালা ও অনন্তে কনুই পর্য্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন—দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়। যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে

এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন—ট্যারা কানা নয়। পায়চারী করালেন—খোঁড়া নয়। স্থকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন—দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেই!

দেখার পালা শেষ হ'লো। বাড়ী ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে যোগীবর, পছন্দ তো?

স্থকুমার চুপ করে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণং।

—সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া! এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়!'—কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখলেন।

পিসিমা বললেন—ছেলের আপত্তি তো হবেই। হাঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতে চলবে না।

স্থন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাস ডাক্তার পাত্রী দেখছেন আর ট্রাজেডি এই যে, তাঁর চোখে অস্থন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাস ডাক্তার কাউকে স্থন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথমে ছেলে, যাকে জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে, তারই মতটা গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাস ডাক্তারকে মর্ম্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে এ দৌর্ব্বল্য তাঁর আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নিবিষ্ট মনে কৈলাস ডাক্তার এই

কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্ব্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জ্জন ময়না ঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না—কাকে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ—এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কে জানে? কিন্তু তাঁর এই ভিন্ জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কই? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চীৎকার আর লাফঝাঁপ। ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্ত্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুৎ করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে বাড়ীর সবাই এল বেরিয়ে।

কৈলাসবাবু বললেন—কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

—এ ব্যাটার নাম হাবু, বোষ্টম তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পটিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো—কৃপা কর বাবা!

—এই বুড়ীটা কে?

—এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে ইরাণী বেদিয়া—বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো—বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠ্ঠি দানা হুজুর!

—আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

—আপন মেয়ে ?

—হাঁ পিসিমা এদের কাণ্ড ! যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই করা থালা হাতে বসে আছে চুপ করে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্ব্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। তান্ত্রিক ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্ত্তির মত কালিমাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেঢপ টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে দস্তুর একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়, গা শির শির করে। কিন্তু যদু বললো—তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসে নি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। নতুন আফিমের গুদাম হবে সেখানে। সহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেই।

হাবু কান্নাকাটি করলো—একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচি-পাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁসবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রোগ বালাই নেই।

পিসিমা বল্লেন—যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো—আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দি। এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

—হাঁ দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়ীও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্ব্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে হেসে বললেন—দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো?

ঝি উত্তর দিল—বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু আর একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখা হলো দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্য্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া মঙ্গোল কপাল, ছোট চিবুক, গোল গোল চোখ। গায়ের রং মেটে কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দুটোতে তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত্ত একটু ছায়া। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে জানে তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন—হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না।

তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাস ডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচায্যি আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠছে। ভটচায্যি বাড়ীর সকলকে বুঝিয়ে গেছেন—নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিষটা। কুলনারীর গুণ লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্ব্বাচন করতে হবে—গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সব দিক যাচাই করে দেখতে হবে। সারা জীবনের ধর্ম্মসাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই হলো না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবে চিন্তে কৈলাস ডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়স একটু বেশী। রোগা বা অতিতন্বী দুইই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কি না আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করলো রাণু।—না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋষি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারের। হাঁ না বলা তার ধাতে

সম্ভব নয়। কিম্বা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝা গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন—ভালই হলো। জানি তো, যা কিপটে এই অনাদি চাষা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞী মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—পাত্রীর রাশি আর গণ, খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ও কোন তুচ্ছ করার জিনিষ নয়।

—সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারেরর কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ীর সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেল।—যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পতাকারিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ; সুন্দরী রামা, রাজপদং ধনসুখং আর, আর কত বলবো।

—এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধম্‌কে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের পাশে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাইকরা থালাটা।

যদু কোত্থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিল।—ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদি! কেমন ঘুপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাক্, গালমন্দ করিস্ নে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল্।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে বললেন—কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

—আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

—চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেই।

—কি রকম ?

—কি রকম আবার ? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে ?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাস ডাক্তার বললেন—পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম! একবার ভাব তো কানাই, কোন ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কাণ পর্য্যন্ত ইয়া ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চিজ হবে সেটা !

কানাইবাবু বললেন—যা বলেছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাতপাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য আছে ; অ্যানথ্রপলজিস্টরা যেমন বলেন··।

—অ্যানথ্রপালজিস্ট না চামড়াওয়ালা। কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন।—আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়না ঘরে। দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অষ্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ ! মেলা বকো না আমার কাছে !

কানাইবাবু সরে পড়ার পথ দেখলেন।

—জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্ব্বর আর কাকে বলে, বিংশ শতাব্দীর টাবুসর্ব্বস্ব ফাজিলের দল !

কৈলাস ডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সত্যদাসের বাড়ী থেকে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুসী মনে কৈলাস ডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে মস্করা করছে।

—এই রাস্কেল সব! কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলার বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন—ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুর ঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সরে পড়ে বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন—সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা একবার দেখে এস। আমায় আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নেই। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রঙ। সমস্ত অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য। মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত অস্থিসজ্জা আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকেও লজ্জা দেয়। দ্রাবিড় শোণিতে পুষ্ট চওড়া করোটির ওপর অতি কুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবকের মত। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হলো। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং তাতে অকুতোলজ্জ স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন মিশিয়ে আছে।

সত্যবাবু মেয়ের গুণপনার পরিচয় দিলেন।—বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতি বছর স্পোর্টে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকুমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো—এ নিশ্চয় রাক্ষস গণ পিসিমা

পিসিমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—হাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টা কট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

কৈলাস ডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতার সঙ্গেই বিয়ের একরকম ঠিক। এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয়নি তাই হলো। সুকুমারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—সত্য দাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি বাবার। ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে ভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রস্থ বাক্‌যুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন—ঐ হতকুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিম্‌টে দিয়ে বিদেয় করে দাও না!

এতেও কৈলাসবাবুর অটলতায় ব্যতিক্রম হলো না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্ত্তি হয়ে রাণুকে বললো—সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো!

—কোন্ দৈবজ্ঞী?

—ঐ যে-বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাস ডাক্তার শুনলেন এ বার্ত্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছ ?

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন—কি হয়েছে ?

—ছেলের বিয়ে দিতে চাও ?

—কেন দেব না ?

—সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও ? সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী পাত্রী।

—বেশ, তবে লিখে দাও আমাকে, সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্ক-বিম্বাধর—আরও যা যা আছে সব লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মা'র মেজাজও ধৈর্য্য হারাবার উপক্রম করলো। তবু মনের ঝাঁঝ চেপে নিয়ে বললেন—তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্র দেখতে হবে না। আমরা দেখছি।

ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তা হলে আমি দায়মুক্ত ?

—হাঁ।

কৈলাস ডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেন। হাসপাতালে যান আসেন। রুগী নিয়ে, ময়না ঘরের লাস নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাস ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদু ডোম আর নিতাই মিলে তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

—কি ব্যাপার নিতাই ?

বড় পাজি এ ছুঁড়িটা হুজুর। পয়সা দেয় নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলো। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখিরীর জাত, দয়া করলেই কুকুরের মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়ে মত্তা বাতুলীর মত আরও কটা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাস ডাক্তার বললেন—সব সময় ফটকে তালা বন্ধ রাখবে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ী ফিরতেই কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হলো লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—এ কি? ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, স্নকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা; তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা চুরি করে বেমালুম সরে পড়লো!

কৈলাস ডাক্তার সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলেন।—আমার ঘরটা সব তছনছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাস ডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হলো।

দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত আকাশে দুর্য্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাস ডাক্তারকে জানালেন

—সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমারের আর সবারও পছন্দ হয়েছে। বংশে, শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ। সুখবর।

—আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্ব্বাদ করতে যেতে হবে।

—তা, যাব।

যদু ডোম এসে খবর দিল তিনটে লাস এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাস ডাক্তার বললেন—চল্ যদু। এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আবার নানা কাজ রয়েছে।

ময়না ঘরে এসে কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বাল।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—রাত হবে না কি রে যদু?

—আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাস, পচে পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমিই চিরে ফেড়ে দেব। বাকী একটা শুধু…।

—নে কোনটা দিবি দে। কৈলাস ডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাসের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাস ডাক্তার চমকে বললেন—অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস ডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো—হাঁ হুজুর তুলসীই, সেই ভিখিরি মেয়েটা।

কৈলাস ডাক্তার বোকার মত যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু সেই অবসরে তুলসীর পরিহিত নোংরা সাড়ীটা, গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাচ্ছিস্ কোথায়?

স্পিরিট দিয়ে লাসটা মোছ ভাল করে। ইউকালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে, আর একটা বাতি জ্বাল।

—One more unfortunate !

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাষ ছিল। তুলসীর লাসে হাত দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

করাতের তুপোঁচে খুলিটা তুভাগ করা হলো। কৈলাস ডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোঁস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাসের ওপর। গলাটা চিরে দেওয়া হলো লম্বালম্বি ভাবে। বুকের মাঝখানে ও তুপাশে বড় বড় পোঁচ দিয়ে ধড়টা খুলে ফেলা হলো। সাঁড়াসী দিয়ে পট্‌পট্‌ করে পাঁজরাগুলো উল্টে দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিম্‌টে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—অভিমানে অনুজ্জ্বল তুলসীর নিশ্চল তুটী কণীনিকা, শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেত পটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

—ইস্, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাস ডাক্তার বললেন।

যতু বললো—হাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো। সুইসাইড কি না। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

—গলা টিপে মারে নি তো কেউ। কৈলাস ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন তো নেই! গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা

—এত লালা! মরার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

—হাঁ হুজুর, ভিখিরি তো! খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাস ডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপাজীবা নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাসে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত!

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীত পিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আড়ালে, আনাচে কানাচে রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল।

কৈলাস ডাক্তার বিমুগ্ধ হয়েই দেখছেন—থরে বিথরে সাজানো সারি সারি এই রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে দেখলেন—পীতাভ খণ্ড স্ফটিকের মত ছোট বড় এই গ্রন্থির বীথিকা আর প্রশান্ত মুকুট ধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীর নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাস ডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবু, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্য্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন। যাক্‌·· ···।

কৈলাস ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো— এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হলো পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ, পাউরুটী—বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পড়লো মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাস ডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো টেবিলের ওপর।

ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন কৈলাস ডাক্তার। নিকেলের চিম্‌টের সুচিক্কন বাহুপ্রুট চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন—পরিশল্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটী পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্ব্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।

আবেগে কৈলাস ডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থর থর করে। যদু এসে ডাকলো—হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই বললো—এত দেরী কেন রে যদু?

—শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

সবলা

ডোমেদের প্রধান গাঁওবুড়া এলাচি ডোম। যৌবনের জলুস উবে গেছে কবে, জীবনের ধার গেছে ক্ষয়ে; পরমায়ুর প্রান্তে এসে ঠেকেছে আজ। জরা আর ভীমরতির পাকে প'ড়ে ধুকধুক করছে শুধু। যাই যাই করেও যেন আর যেতে চায় না।

মোরগের ডাকের সঙ্গে এলাচির ঘুম ভাঙে। জেগে উঠেই পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকে—টুকিয়া, ওরে টুকিয়া, শিগগির ভাত দে।

—এক লাথি মেরে সব গলাবাজি বন্ধ করে দেব বুড়ো। শুধু খাই আর খাই। নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খা না।

টুকিয়াও ঘুম ছেড়ে রাগে গরগর করে বেরিয়ে যায়। গাঁওবুড়া এলাচি তার অষ্টাবক্র গ্রন্থিল দেহভার তুলে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। কঞ্চি দিয়ে গা চুলকোয়। মাথাটা ঘড়ির কাঁটার মত প্রতি সেকেণ্ডে ঠক ঠক করে কাঁপে। গাল দেয় টুকিয়াকে, গাল দেয় টুকিয়ার মৃতা মাকে, যার চরিত্র নাকি কোন কোলিয়ারির সাহেবের কাছে বাঁধা ছিল।—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বেজন্মা, নইলে বুড়ো বাপকে এত অবহেলা!

এলাচির গালাগালি আর অভিশাপের প্রবাহ অবিরল ধারায় গড়িয়ে চলে দুপুর পর্য্যন্ত। শ্রান্তিতে ঘুণধরা ধড়টা ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসে। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খায়।

এমনি সময় ঘরে ফিরে আসে টুকিয়া। বুড়োর সুমুখে ঠেলে দেয় এক থালা ভাত আর এক হাঁড়ি তাড়ি বা মদ। বুড়ো জুত ক'রে উঠে বসে। বিশীর্ণ ঘাড়টা সারসের মত ঝুঁকিয়ে অনুভব করে—এক হাঁড়ি তরল প্রাণের গন্ধ। এই জন্যেই তার বেঁচে থাকা।

—জিতা রহো বেটী। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্ব্বাদ করে।—তুই আছিস বলেই তোর বুড়ো বাপটা বেঁচে আছে। বুড়ো ডুকরে কেঁদে ফেলে। —আর তোর মা। অমন বউ দেবতারও হয় না রে টুকিয়া! বুড়ো ভাতের থালা সামনে টেনে নেয়।

দু তিন মুঠো ভাত গিলে ক্লান্ত ঘোড়ার মত তাড়ির হাঁড়িতে ঠোঁট নামিয়ে দেয়। ঢকঢক ক'রে খেয়ে ফেলে। থেমে নিয়ে তামাক টানে।

তাড়ি ভেজা নোংরা দাড়িতে মাছি উড়ে এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ঠাণ্ডা ভাতের থালার গা বেয়ে চড়ে পিঁপড়ের সারি। বুড়ো বুঁদ হয়ে ঝিমোয়। তার সাদা ভুরু দুটো চোখের কোটরের ওপর পর্দার মত ঝুলে পড়ে।

এত দীনতা এলাচির সংসারে আজই দেখা দিয়েছে, চিরটা কাল এমন ছিল না। সেণ্ট্রাল জেলের জহ্লাদ এলাচি—মাইনে ছিল ভাল, উপরি আয়ও মন্দ হ'ত না। সব চেয়ে মোটা দক্ষিণা আদায় হ'ত ফাঁসির আসামীর মায়েদের কাছে।

মায়েরা বলত—দোহাই বাবা জমাদার! টানা-হ্যাঁচড়া মারধর ক'রে ছেলেটাকে শেষ সময়ে আর কষ্ট দিস্ নি বাবা!

—তা একটু করতে হবে বৈকি। সহজে কি আর কেউ তক্তায় উঠতে চায় মায়িজী।

—না রে বাবা জমাদার। নে, বিশটা টাকা রাখ, এই রূপোটা নে। কিন্তু কথা রাখিস্।

এলাচি খুশী হ'য়ে আশ্বাস দিত। বেশ, বেশ, দড়িটা না হয় চর্বিতে ভিজিয়ে নেব ভাল করে, যাতে গলার চাম টাম ছ'ড়ে না যায়। তবে আগে দুটো টাকা দাও আমার মেয়েকে, মেঠাই খেতে।

এ-সব অনেকদিন আগের কথা। টুকিয়া তখন দু বছরের মা-মরা শিশু।

ভাত আর তাড়ি। এই সামান্য অন্নপানটুকু গাঁওবুড়া হিসাবে তার প্রাপ্য দক্ষিণা। কিন্তু কেই বা আর শ্রদ্ধা ক'রে খুশী মনে দেয়। ডোম গৃহস্থদের দ্বার হ'তে দ্বারে ঘুরে, অনুনয় ক'রে, চোখ রাঙিয়ে, ঝগড়া ক'রে টুকিয়া আদায় ক'রে আনে গাঁওবুড়ার এই সম্মানী।

ভিক্ষাজীবী ডোম মেয়েরাও টুকিয়াকে অনুকম্পার চোখে দেখে। তাদের বরাতেও ডালরুটি জোটে। টুকিয়া সম্মানী যা পায়—তারাও দেখে লজ্জা পায়।

সমবয়সী ভিখিরী মেয়েরা ঠাট্টা ক'রে বলে—বুড়োকে এবার একটি জামাই আনতে বল না টুকিয়া। তা হ'লেই তো তোর এ মেহন্নতের জ্বালা দূর হয়।

টুকিয়া তাদের গালে ঠোনা মেরে জানিয়ে দেয়—বুড়োর দেওয়া জামাই আমি নেব কেন? আমার বর বাছব আমি।

টুকিয়া চলে গেলে ভিখিরী মেয়েরা আলোচনা করে। তারাও সে কথাটা শুনেছে। টুকিয়া জাতের বাইরে কার সঙ্গে ফেঁসেছে। পঞ্চের বৈঠকে এর নিষ্পত্তি হবে। টুকিয়াকে শাস্তি পেতে হবে।

গাঁয়ের সবারই চোখে টুকিয়া সুন্দর। পরবের দিনে খোলা মাঠে নৃত্যপরা টুকিয়ার তনুরুচি আড্ডার চোখে চোখে কুহকবাষ্প বুলিয়ে দেয়। বয়োবৃদ্ধেরাও আফসোস করে—ভাল লাচ্‌নী হ'ত মেয়েটা, চাল-চলন যদি একটু নরম সরম হ'ত। সব মাটি করেছে ওর ঐ রুদ্রা স্বভাব—কনকধুতুরার মত। দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকাই যায়।

নতুন এক জোয়ান এসেছে এ গাঁয়ে। মঙ্গল তার নাম। গাঁয়ের ওঝা তাকে দিয়েছে আশ্রয়। কিন্তু ধরা পড়ে গেল মঙ্গল। আসলে সে

ডোম নয়—মুণ্ডা জংলী। তার ওপর আরও খবর পাওয়া গেছে—সে ডাইনীর ছেলে। দেশ ছেড়ে এসে রয়েছে ডোম সেজে, চাকরি জোটাবার ফন্দিতে।

এ হঠকারিতার যথোচিত শাস্তি পেতে হ'ল মঙ্গলকে। ডোমেরা নিদরুণভাবে পিটিয়ে তাকে গাঁয়ের বার ক'রে দিল। ডাইনীর ছেলে গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে তুক্ ক'রে রেখে গেল গাঁয়ের সেরা জিনিসটি—যুবক-ডোমের কামনার ধন ওই টুকিয়াকে। এ ব্যাপারে সমস্ত গাঁ জুড়ে যে বিক্ষোভের ঝড় উঠল, তার জের আজও মেটে নি, মিটছেও না।

নড়বার নাম নেই, মঙ্গল মুণ্ডা একটা দুষ্টগ্রহের মত ঝুলে রইল ডোম গাঁয়ের দিগন্তে। কুকুর-মারা ঠ্যাঙা হাতে ডোমেরা ক'দিন রইল তাকে তাকে। বাগে পেলে এক বাড়িতে তার প্রণয়কলাপ্ আর ইহলীলা একই সঙ্গে ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু বেটা জংলী বড় জবরদস্ত, তার ওপর সর্বদা খোঁপায় ঝোলানো এক গোছা বিষ মাখানো তীর। উড়ন্ত সাপের মত অলক্ষ্যে কখন কাকে এসে ছোবল দেবে কে জানে! কাজেই সংঘর্ষটা তেমন জমে উঠল না। ওঝার বহুদিনের মন্তরবন্দী অশরীরী পিশাচটাও জংলীকে ঘায়েল করতে পারল না।

প্রতিবেশীরা দলে দলে এসে বুড়ো এলাচিকে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—গাঁওবুড়া, হয় মেয়ের বিয়ে দাও, নয় মেয়েকে সামলাও। নইলে তোমাকে জাতে রাখা আর সম্ভব হবে না। আমাদের অন্য গাঁওবুড়া দেখতে হবে।

প্রতিবেশীদের হাত ধ'রে সকাতরে বুড়ো বলে—কেন বেরাদার, তোমরা এত চটেছ কেন? কি করেছে মেয়েটা?

—কি করেছে? রাত বেরাতে মঙ্গলের সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে। ওকে

ভাত পৌঁছয়, সলা-পরামর্শ দেয়, সমস্ত পঞ্চ বিগড়ে উঠেছে এসব কুকাণ্ড দেখে। জাতের বাইরে……ছি ছি।

পঞ্চের গুপ্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হ'ল—মঙ্গলকে জব্দ কর। টুকিয়া ওকে ভাত পৌঁছতে পারবে না। গাঁওবুড়াকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, এর ব্যতিক্রম হ'লে তারা একজোটে সম্মানী দেওয়া বন্ধ করবে।

গাঁওবুড়া এলাচিও ক্ষেপে গেছে। গেল গেল, সব গেল। বন্ধ হ'ল তার ভাত আর মদ। ওঝার হাত ধ'রে মিনতি করে বলে—সবুর কর দোস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে। বুড়াকে পেটে মের না বেরাদার। ধর্ম্ম ভুলে যেও না।

প্রত্যুত্তরে ওঝা আশ্বাস দিয়ে জানায়—সে ধর্মজ্ঞান আমাদের আছে। কিন্তু বেটিকে বুঝিয়ে দাও, জংলী শালা যেন মোটা না হ'তে থাকে আমাদেরই ভাত মেরে।

—টুকিয়া, শোন্ বেটী! এলাচি আদর করে ডাকল।—পঞ্চের সভা এল বলে। তোর বর বাছাই হবে সেদিন। ওঝার ছেলের সঙ্গেই ঠিক করেছি। পঞ্চের সামনে গিয়ে কবুল করে নিবি। বুঝলি?

টুকিয়া সংক্ষেপে জানিয়ে দিল—সে আমি পারব না।

—কি পারব না? বুড়ো দারোগাই মেজাজে গলার স্বর এক পর্দা চড়াল।

—কি আবার রে বুড়া? যেন জানিস না কিছু? আমি মঙ্গলকে কথা দিয়েছি।

—কি? মঙ্গল? জাতের বাইরে? হুঁসিয়ার হো যাও হারামজাদী! নইলে এই বেত দিয়ে ফাঁসিয়ে ঘাড়টা একেবারে মুচড়ে দেব।

নিমীলিতচক্ষু বুড়োর মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে ধ'রে টুকিয়া বলল,—এই দেখ, হেই বুড়া! এই করবি তুই।

বুড়ো অবশ হাতে তার দুপাশে হাতড়ে দেখল—চেলাকাঠ, লাঠি বা ইট-পাটকেল। ততক্ষণে টুকিয়া ঘরের বাইরে।

সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ঘুরেছে মঙ্গল। গেরুয়া ধুলোয় শরীর গেছে ছেয়ে। মাটিতে একেবারে লুটিয়ে শুয়ে সে টুকিয়ার কথাগুলো গিলছিল। সামনে পলাশের একটা নীচু ডাল ধ'রে টুকিয়া হেলে দুলে ব'কে চলেছে।

—কাল থেকে তোর ভাত বন্ধ।

—বেশতো, জঙ্গলের ডুমুর খাব।

—হাঁ, তাই খাবি।

—বলছি তো খাব। রোজ ডুমুর খাব। কিন্তু একদিন এসে দেখবি আমি আর মঙ্গল নই। ভালুক হয়ে ঝুলছি ডুমুরের ডালে। এই রোঁয়া, এই নখ, এই থাবা……।

মঙ্গলের অভিমানের প্রলাপ থামিয়ে দিল টুকিয়া। পায়ের চেটো দিয়ে মঙ্গলের ধুলো ছাওয়া পিঠটা আস্তে আস্তে ঘ'ষে দিয়ে বলল—বড় ঘাবড়ে গিয়েছিস্, না রে মঙ্গল? ভয় কি তোর? আমি রয়েছি। তবে তোকে কাজ করতে হবে।

চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে টুকিয়া বলল,—রোজ রাত্তিরে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। বল রাজি আছিস্?

—হাঁ।

—মাঠে মাঠে যাবি। খবরদার সড়ক ছুঁসনা যেন। লোহার পুলটা পেরিয়ে দেখবি কুলের বাগিচা। পেছনের ঘেরান ভেঙে

আস্তে আস্তে ঢুকে পড়বি। বেছে বেছে লাক্ষার গুটিভরা এক বোঝা ডাঁটা নিয়ে আয়।······মারোয়াড়ী ঠিক করেছি। এক এক বোঝা পাঁচ পাঁচ টাকা।

মাঝরাত্রে মঙ্গল ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার রক্ত মাখা দেহটা পলাশতলায় কাটাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল। পিঠে বল্লমের খোঁচা-লাগা একটা সুগভীর ক্ষত।—দারোয়ানে ঘিরেছিল রে টুকিয়া। উঃ, কোন মতে পালিয়ে এসেছি।

চালে ভুল হয়েছে। টুকিয়া ভাবনায় ডুবে রইল কতক্ষণ। এ পথে চলবে না রোজগার, প্রতিপদে মরণ, মার আর জেল। জংলীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর সে হ'তে পারবে না।

নতুন রোজগারের হদিস দিল টুকিয়া।—রিজার্ভ জঙ্গল থেকে মরা জানোয়ারের হাড় কুড়িয়ে নিয়ে শহরে গিয়ে বেচে আয়।

ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে অরণ্যের জঠর হাতড়ে বেড়াল মঙ্গল। একটা পুরনো উইঢিবি খুঁড়ে বার করল গোটা চারেক পাহাড়ী ডোমনার মেরুদণ্ড। মরা কেঁদগাছের ঝোপে পেল দুঝাড় হরিণের শিং। স্রোতের ধারে বালিতে আধপোঁতা নীলগাইএর পাঁজরাও পেল একটা।

হাড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে জঙ্গলের গাছের ভীড় ঠেলে খোলা জমিতে পা দিতেই মঙ্গলের একেবারে মুখের ওপর এসে ঠেকল একটা ফেনসিক্ত ঘোড়ার মুখ। অশ্বারূঢ় জঙ্গল দারোগা।

—লাইসেন্স?

হতভম্ব মঙ্গল হাড়ের প্রকাণ্ড বোঝাটা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি বে শশুরকা নাতি? তোর বাপের জঙ্গল এটা?

মঙ্গলকে সদরে চালান করা হ'ল। সপ্তাহ পরে খবর এল—কয়েদ, এক বছরের জন্য।

মঙ্গলের কুঁড়ের খুঁটি ধরে টুকিয়া কাঁদল।—বড় বেইজ্জৎ হলো বেচারা। আর হয়তো আসবে না। বয়েই গেল তাতে। ডোমগাঁয়ে কি আর জোয়ান নেই—সূর্য্য, বংশী, বিদেশী…।

মঙ্গল মুণ্ডা জেলে। ডোমগাঁয়ের প্রজ্বলিত সামাজিক উষ্মা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। টুকিয়ার পাণিপ্রার্থী ডোমমহলে সুপ্ত ভরসা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। সাপ সরে গেছে মালঞ্চ ছেড়ে। অনেকগুলো হাত এগিয়ে এল একসঙ্গে।

এল ওঝার ছেলে সূর্য্য ডোম। হাসপাতালের টি বি ওয়ার্ডের মেথর। গাঁওবুড়ার পা টিপে দিয়ে নিবেদন করলো—বাবা, এইবার ব্যাপারটা চুকে যাক্। আর দেরী নয়।

এল মশান মজুর বিদেশী ডোম। মড়ার লেপতোষকের তুলো আর নেবানো-চিতের কাঠকয়লা বেচে পয়সা জমেছে কিছু। ঘরে বসে রেজকি-ভরা পেতলের ঘটি ক'টার দিকে তাকায় আর একটি গৃহলক্ষ্মীর জন্যে মন আনচান করে। বুড়োকে এক বোতল বিলিতী মদ প্রণামী দিল। —এইবার টুকিয়ার সঙ্গে মন্তর পড়ে হাত মিলিয়ে দাও বাবা।

ময়নাঘরের দারোয়ান বংশী ডোম এল। কত কচি ছেলেমেয়ে, মাগী-মরদ, ইংরেজ, বাঙালীর লাস পার হয়েছে তার হাত দিয়ে। বেওয়ারিশ লাসের গা থেকে খুলে নেওয়া হাঁসুলি চুড়ি, তাগা, হার—কত সামগ্রী! তার তামার গাগরিটা প্রায় ভরে এল। সটান বুড়োর পা জড়িয়ে ধরে বিয়ের প্রস্তাব জানাল। —একটু তাড়াতাড়ি কর বাবা।

বুড়ো এলাচিও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে নিয়েছে যে তার বার্দ্ধক্যের

একমাত্র নির্ভর একজন সুযোগ্য জামাই। নইলে, মদের অভাবে তার সুমুখের এই এমন সরস পৃথিবীটা শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কাউকেই হাতছাড়া করতে চায় না বুড়ো। সবাইকে সাগ্রহে আশ্বাস দেয়—সবুর সবুর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঙ্গলের মুক্তির দিন এল এগিয়ে। ডোমগাঁয়ের প্রসুপ্ত বিক্ষোভ আবার শত শিখায় জ্বলে উঠল। পঞ্চের বড় বৈঠক হবে—চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে এইবার।

এলাচির যুক্তি বুদ্ধি যেটুকু ছিল তাও এল ঘোলা হয়ে। চোখের সামনে জাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে মেয়েটা। তাও কি না আবার একটা জংলী শেয়ালের সঙ্গে। হায় পরমাত্মা! কোন কাজেই আসবে না। গাঁওবুড়ার আসন এবার সত্যই টলে উঠল।

নেশায় আজকাল আর সে আমেজ আসে না। মাথায় কেমন জ্বালা ধরে।—ভেজাল মেরেছে শালারা সব! জল মিশিয়েছে। বুড়ো মদের ভাঁড় লাথি মেরে হঠিয়ে দেয়।

আগামী পঞ্চের বৈঠকেই হবে তার মৃত্যু। গত্যন্তর নেই। ঘরে একটা চণ্ডা মেয়ে আর বাইরে ক্ষমাহীন পঞ্চ।

এলাচির মনে পড়লো হিজ্‌রে কাশী ডোমের পরামর্শটা।—হাঁ, কাশী কথাটা মন্দ বলে নি।

—টুকিয়া, টুকিয়া, টুকিয়া। বুড়ো গলা চিরে ডেকে ডেকে কেঁদে ফেলল।—জাত ছাড়বি তুই?

—হাঁ।

—আমি খাব কি।

—তা আমি কি জানি। মরিস না কেন?

—অবুঝ হোস্ না বেটি। যদি জাতই ছাড়বি তো জংলীটার জন্যে কেন?

— কার জন্যে ছাড়ি বল্‌তো ?

—কাশী একটা খবর দিচ্ছিল। শুনবি ? বুড়ো যথাসাধ্য তার গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বলল—বানার্জি ডাক্তারের বাড়ী কাজ করবি ? টাকা পয়সা ভালই পাবি। সামান্য ঝাড়ু ট্যাড়ু দিতে হবে।

—ওসব আমি পারব না বুড়ো। মঙ্গলের ছেলে রয়েছে আমার পেটে।

আহত নেকড়ের মত বুড়ো বিশ্রী চীৎকার ছাড়ল—কি ? কি বল্‌লি রে ধর্ম্মহারা মেয়ে ?

এবার টুকিয়া হেসেই ফেলল।—নে বুড়ো খুব হয়েছে, থাম এবার। যত মদ খাবি, যত ভাত তামাকু খাবি সব দেব। তোর আর পঞ্চকে অত ভয় করতে হবে না। কিছু ভাবতে হবে না তোকে। ওদের জবাব দিয়ে দে।

—জিতা রহো বেটি। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্ব্বাদ করে। অবসন্ন বুড়ো ক্রমে ঘুমের ঘোঁরে নেতিয়ে আসে। টুকিয়া এক টুকরো চট পাকিয়ে এলাচির মাথার তলায় গুঁজে দেয়। গামছা দিয়ে বুড়োর গা মুছে হাত পায়ের আঙুল টেনে টেনে বাজিয়ে দেয়।—ঘুমো বুড়ো ঘুমো। দুটো ভাত আর মদ, এই তো ? এইটুকু যদি না করতে পারি তবে আমি ডোমিন নই।

টুকিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। তার চেতনা ছাপিয়ে জেগে ওঠে পুরা মানবীর মাতৃতান্ত্রিক দর্প।

গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে টুকিয়া মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। আজই তো তার খালাস হবার কথা।

সূর্য্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। ধানকাটা ক্ষেত ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির উড়ে চলেছে। পলাশতলার কুঁড়েটা একেবারে ধসে গেছে।

মৌরীবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে গুল্‌তি ছুঁড়ছে কে? হাঁ, সেই তো!

—আর বসে বসে গুল্‌তে ছুঁড়লে চলবে না। রোজগার করবি তো কর। নইলে আমার আশা ছাড়।

এতদিন অদেখার পর এই রূঢ় সম্ভাষণ। মঙ্গল টুকিয়ার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

—আচ্ছা, ভাবিস্ না। কাল আমার সঙ্গে শহরে যাবি। হাসপাতালে পাংখা কুলির দরকার।

সদর শহর। জংলীর মুখে শব্দ নেই। সব ঝঞ্ঝাট টুকিয়াকেই একা ভুগতে হ'ল।—যা, ঐ যে বাবুটি বসে আছে দোকানে, তাকে গিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে বল। এমনি করে আদাব জানাবি।

টুকিয়া সবই শাসিয়ে শিখিয়ে দেয়, মঙ্গল এগিয়ে যায় আর বিমুখ হয়ে ফিরে আসে।—অপদার্থ জংলী কোথাকার! আয় আমার সঙ্গে।

—বাবুজী! ঠোঁট দুটো পাতলা হাসিতে রাঙিয়ে নিয়ে, কালো চোখের তারা দুটো নাচিয়ে বাবুটির প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে টুকিয়া বলে—বাবুজী! একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

লেখা দরখাস্তটা নিয়ে টুকিয়া মঙ্গলের হাতে দিল।—এই নে, এবার হাসপাতালে চল।

হাসপাতালের কেরানীবাবুর সামনে দরখাস্তটা সঁপে দিয়ে মঙ্গল দাঁড়াল।

—অ্যাঁ মুণ্ডা? তোম্ মুণ্ডা হায়?

—হুজুর।

—যাও থানাসে সার্টিফিকেট লে আও। আচ্ছা দাঁড়াও।

টেলিফোনের চোঙটা তুলে নিয়ে কেরানীবাবু ডাকলেন—হ্যালো সাবইন্‌স্পেক্টর। একবার রেজিস্টারটা দেখুন তো। নাম মঙ্গল মুণ্ডা —কোন ব্যাড ক্যারেক্টর কি না।

—ওরে বাবা! এ যে দেখছি সর্ব্বগুণাধার নরোত্তম। সি ক্লাস দাগী। সব-ইনস্পেক্টরের প্রত্যুত্তর এল।—বাঘ ভালুকের মতিগতি তবু বোঝা যায় মশাই, কিন্তু এসব জংলী ফংলী…।

ফোন নামিয়ে কেরানীবাবু বললেন,—এই মঙ্গল মুণ্ডা, কেটে পড় বাবা। তোম্ দাগী হায়। নোকরি নেহি হোগা।

মঙ্গলের বর্ব্বর মস্তিষ্কে বোধগম্য হলো না কিছু। টেলিফোনের চোঙটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে তার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম করে উঠল। প্রেতের ভোঁতা মুখের মত ঐ বস্তুটা এখনি এক ফুঁয়ে যেন তার চোখের সব আলোটুকু নিভিয়ে দেবে।

অন্তরালবর্ত্তিনী টুকিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনল। আচম্‌কা এসে রূঢ়মুষ্টিতে মঙ্গলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে।—চল্ বন-বিড়ালের বেটা। তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

নিঃশঙ্কিনীর প্রত্যেকটি অভিযান নিদারুণ নিষ্ফলতায় একে একে লুটিয়ে পড়ছে ধূলোয়। টুকিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে গুম হয়ে বসে রইল।

মঙ্গল হঠাৎ টুকিয়ার হাত ধরে বলে উঠল—এবার আমায় ছাড় টুকিয়া। তুই আর কাউকে বিয়ে কর্। যাবার আগে তোদের ওঝা আর ঐ কেরানীবাবুটাকে বিঁধে দিয়ে সরে পড়ি।

—না, তোকে যেতে হবে না কোথাও। চল্ ঘরে, একটা কথা আছে।

বুড়ো এলাচি সগর্ব্বে ও সহুঙ্কারে পঞ্চের হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছে। গাঁওবুড়ার পদ সে পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। সে ও তার মেয়ের ওপর পঞ্চের কোন নির্দ্দেশ চলবে না।

ওঝা শাসিয়ে গেছে—এবার ভূত লেলিয়ে তোদের বুকের কল্‌জে চুরি করাব।

বুড়ো বেঁচেছে। খুশী হয়ে কন্যারত্নটীকে আশীর্বাদ করে আর দিন-রাত স্বচ্ছ সুগন্ধি মদ খায়। কোথা থেকে কেমন করে আসে, সে খবরে তার তিলমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

টুকিয়া আর মঙ্গলের ব্যস্ত সংসারযাত্রা সুরু হয়েছে এদিকে। ভোরে উঠেই মঙ্গল একবোঝা দাঁতন মাথায় নিয়ে সহরে যায়। অত বড় জোয়ানের ঘাড়টাও দাঁতনের ভারে বেঁকে যায়। এর একটু রহস্যও আছে। বোঝার ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকে কমপক্ষে দশটি বোতল মদ—বাড়িতে লুকিয়ে চোলাই করা। সহরের একটা আড্ডায় এগুলির গতি করে মঙ্গল ট্যাঁক ভারী করে ফিরে আসে।

সিকি আধুলি টাকা। মঙ্গল জীবনে এই প্রথম নিজ হাতে রূপো ছুঁয়ে দেখলো। অপূর্ব এর স্পর্শসুখ, এ এক ধাতুময়ী মায়া। একটা নতুন নেশা। জংলীও আজকাল গোলাপী গেঞ্জী গায় দেয়। টুকিয়া সাবান দিয়ে গা ধোয় আর চুমকি বসানো কালো শাড়ী পরে।

চন্দ্রগ্রহণের দিন। আজ সন্ধ্যে থেকেই ডোমগাঁ প্রায় জনশূন্য। সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে সহরে। গ্রহণ লাগলেই গৃহস্থদের ঘরে ঘরে তারা দান কুড়িয়ে ফিরবে।

রাত্রিবেলা বুড়ো এলাচিকে খাইয়ে শুইয়ে টুকিয়া মঙ্গলের ঘরে এল। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসল—ভাত মাংস মদ। চোলান মদের জালাটা আর গোটা কয়েক খালি বোতল সম্মুখে রাখা। আগামী কালের পণ্যসম্ভার আজ রাত্রেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

পাহাড়ী ঝর্ণার মত খল খল করে হেসে টুকিয়া মঙ্গলের মাথাটা

জড়িয়ে ধরে। একান্তভাবে তারই দাক্ষিণ্যের ওপর যাদের নির্ভর, এমন দুজনকে সে দুর্গতির হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ভাঙা সংসারকে সে আবার নিজের মহিমায় জুড়ে দিয়েছে। বুড়ো সুখী, মঙ্গল সুখী, সে সুখী, আরও একজন—সেও আজ তার রক্তের অন্ধকারে সুখসুপ্ত।

মঙ্গল বলে—মাঝে মাঝে আমার ভয় করে রে টুকিয়া। কখন আবার ধরা পড়ে যাই। বাঁচাবি তো?

—হাঁ রে হাঁ, বাঁচাব।

—তা তুই পারিস। তুই যাদু জানিস টুকিয়া। মঙ্গলের মনের মেঘ কেটে যায় ও হাসতে থাকে।

—মঙ্গল মুণ্ডা হাজির হায়! ঘরের বাইরে দরজার কাছেই কনেষ্ট-বলের গলার হাঁক শোনা গেল। মঙ্গলের চোখ থেকে মুহূর্ত্তের পূর্ব্বের, নির্ভরতার আভাটুকু গেল নিভে। টুকিয়া মুখে আঙুল ছুঁইয়ে ইসারায় জানিয়ে দিল—চুপ।

দেওয়াল ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়ালো টুকিয়া। নেশায় পা বেসামাল। বিশ্রস্ত শাড়ীটাকে একটু গুছিয়ে জড়িয়ে নিয়ে দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। কপাটের শেকলটা দিল তুলে।

গ্রহণের অন্ধকারে ছেয়ে রয়েছে পৃথিবী, বাইরের কিছু স্পষ্ট ঠাহর হয় না। টুকিয়া ডাকলো—কে?

—সতের নম্বরের বদমাস মঙ্গল মুণ্ডার ঘর এইটা না?

—হাঁ।

—তুই কে? একজন কনেস্টবল এগিয়ে এসে টুকিয়ার মুখের ওপর লণ্ঠনটা তুলে ধরলো।

—আমি মঙ্গলের জরু।

—মঙ্গলকে বাইরে আসতে বল।

—সে তো ঘরে নেই, শিকারে গেছে।

—বেশ, তা হ’লে তুই সরে যা। ঘরের ভেতরটা একবার দেখে রিপোর্ট লিখে নি।

—ঘরের ভেতর কেন যাবি সিপাহিজী ; আমি বলছি, তোরা তাই লিখে নে।

—ও, বুঝেছি। একজন কনেস্টবল টুকিয়ার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে উদ্যত হলো।

টুকিয়া বললো, দাঁড়া সিপাহীজী, একটা কথা আছে। কনেস্টবলটা টুকিয়ার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল।

—এঃ, নেশাতে যে একেবারে গলে রয়েছ গো। অপর কনেষ্টবলটাও এগিয়ে এল।

চালার খুঁটোতে বিলোল দেহভার হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল টুকিয়া। ঠোঁটে সূক্ষ্ম শ্লেষলিপ্ত দুর্ব্বোধ্য হাসির একটু ছায়া। বললো—বড় মেহেরবান আপনি সিপাহীজী। গরীবকে একটা বিড়ি খাওয়ান দেখি।

মন্দবিন্যস্ত শাড়ীর বিশ্লথ আঁচলটায় হঠাৎ একসঙ্গে দুটো প্রলুব্ধ হাতের ক্রুর আকর্ষণ। টুকিয়া অনুভব করলো শুধু। প্রতিরোধের দুরাশায় তার অবশ হাতটা মাত্র চমকে গিয়ে স্থির হয়ে রইল।

ঘরের ভেতর একটা শব্দ। পাথুরে মেজেতে ঠোকর-লাগা শানিত টাঙির হিংস্র নিক্বণ!

টুকিয়া হঠাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে কনেষ্টবল দুজনের হাত দুটো ধরে বললো—শীগ্‌গির চলো এখান থেকে। একটু দূরে, আরো অন্ধকারে।

শান্ত রাত্রির বাতাসে সহরের দিক থেকে ভেসে আসছে ভিক্ষার্থী ডোমেদের কলরব। গ্রহণকা দান! গ্রহণকা দান!

গ্রহণ ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। আবার চাঁদের মুখ খুলেছে। চারদিকে ফুটে উঠেছে নতুন শুক্লিমার স্ফূর্তি।

একদল বনশূয়োর নামলো আলুর ক্ষেতের ওপর। হুঁস হলো টুকিয়ার। তাড়াতাড়ি নালার জলে স্নান সেরে ক্ষেতের আল ধরে ঘরের দিকে চললো।

ভেজা কাপড়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেখলো মঙ্গল অঘোরে ঘুমোচ্ছে। টুকিয়া ঠেলে ঠেলে তার ঘুম ভাঙালো।

গোত্রান্তর

মকতপুর। কাঁচা সড়কের ওপর এই তো একটা জরাজীর্ণ বাড়ী! খোলার চালের পুরানো বাঁশের ঠাট থেকে ঘুণের ধূলো ঝ'রে পড়ে। তিন বছর পালেস্তারা পড়ে নি। ঘরে এক পাল মানুষ—কাচ্চা বাচ্চা, মোতা কাঁথা আর নোংরা লেপ তোষকের জঞ্জাল। এই তো সঞ্জয়ের স্থইট হোম!

একা বড়দার গোনাগুন্‌তি মাসোহারার জোরে ভাতকাপড়ের ক্ষুধা আর বাগিয়ে রাখা যায় না। সবদিকে ব্যয়বাহুল্য নির্মম ভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এখন কোপ পড়ছে পেটের ওপর। ঘি চিনি চা—সংসারের বুভুক্ষু জিভটার এক একটা অংশ বড়দা প্রতিমাসে ছুরির পোঁচ দিয়ে কাটছেন। এ ছাড়া উপায় নেই। কে জানতো, সঞ্জয় এত লেখা পড়া শিখেও রোজগারের বেলায় এমন ঠুঁটো হয়ে বসে থাকবে। এক আধ দিন নয়, আজ চার বছর ধরে।

বিকেল বেলার হাল্‌কা ঝড়ে বাড়ীর স্থমুখে শিরিষ গাছে শুকনো সুঁটিগুলো ঝুম ঝুম করে বাজে, মোটা ঘুঙুরের বোলের মত। এই সময়টা বেশ লাগে। সারাদিনের সঞ্চিত আলস্য অবসাদে মিষ্টি হয়ে ওঠে।

বারান্দায় বসে এক গেলাস গুড়ের তৈরী চা হাতে নিয়ে সঞ্জয় চুমুকে চুমুকে তার নিত্যদিনের ভাবনাগুলির আস্বাদ ঝালিয়ে নিচ্ছিল।

—যে যার পথ দেখ। বড়দা সময়ে অসময়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু বছর চারেক আগেকার কথা। পরীক্ষার দিন এই বড়দা নিজের হাতে টিফিন কেরিয়ারে খাবার নিয়ে কলেজ হলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেও এক দিন গেছে। বড়দার মনের সুপ্ত সাধ আকাঙ্ক্ষা

গুলি সেদিন ছিল দুঃখ অভাবের কালিতে মাখা—বিনম্র কামনার মালার মত। এই অভাবের গ্লানি একদিন ধুয়ে মুছে যাবে। সঞ্জয়ের একটা চাকরী হবে—রূপোর কাঠির স্পর্শে মকতপুরের দত্তবাড়ী স্বাচ্ছন্দ্যে ঝকঝক করে উঠবে। এই ছিল অবধারিত সত্য।

এম-এ ডিগ্রী। সচ্চরিত্রতা, স্বাস্থ্য আর খেলাধূলার দশটা সার্টিফিকেট, বিলিতি পত্রিকায় ছাপা তার নিজের লেখা তিনটে অর্থনীতির প্রবন্ধ, গান আর অভিনয়ের মেডেল, ভূমিকম্পে সুকঠোর সেবাব্রতের প্রশংসাপত্র—সঞ্জয়ের বহু ও বিচিত্র প্রতিভা একটা মোটা বাণ্ডিলে বাঁধা হয়ে বাক্সে পড়ে আছে। চার বছর দরখাস্তবাজি করে একটা চাকরী জোটে নি। বড়দা হতাশ হয়ে পড়েছেন। মায়ের মুখেও গঞ্জনাবাক্য উথলে ওঠে।

অপ্রতিভ হয়ে গেছে সঞ্জয়। কিন্তু এই ধিক্কৃত চারটি বছরের প্রতি মুহূর্ত্তের ভাবনায় তার অনেক মোহ ভেঙে দিয়েছে। আগে এমনি অবস্থায় পড়লে লোকে বিবাগী হয়ে যেত। কিন্তু সঞ্জয় অন্য ধাতুতে তৈরী। বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রগুলি তার জানা আছে।

সঞ্জয় বুঝেছে, এখানে প্রত্যেকটি স্নেহ পণ্য মাত্র। প্রত্যেকটি আশীর্ব্বাদ এক একটি পাওনার নোটিশ। চার বছর বয়স এই ভাই-ঝি পুতুল, মাথা ধরলে চুলে হাত বুলিয়ে দেয় ঠিকই। কিন্তু সঞ্জয় জানে একরত্তি মেয়ের এই হৃদ্যতার মধ্যে লূতাতন্তর মত কী সূক্ষ্ম কারবারী বুদ্ধি লুকিয়ে আছে। কাজ শেষ হলেই সোজা দাবী জানাবে—সিল্কের ফিতে চাই আমার।

ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর! মা বাপ ভাই বোন, আপন জন,

আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন! একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস। সঞ্জয় এক এক সময় হেসে ফেলে। তবে এ তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের শিরায় শিরায় এই রীতি গড়িয়ে আসছে লক্ষ বছর ধরে। সেই গুহা-মানবের গৃহধর্ম্ম থেকে সুরু করে মকতপুরের দত্তবাড়ীর সংসারকলা। প্রেম প্রণয় আত্মীয়তা—লঙ্কা গুড় আদা মরিচ। যে ক্রেতা সেই আপন জন।

সুমিত্রাও অনেকদিন এদিকে আর আসে না। প্রেমের হাওয়া হয়তো ঘুরে গেছে। আশ্চর্য্য কিছু নয়। সুমিত্রার বাবা অভয়বাবুরও মতিগতি কিছুদিন থেকে উল্টো রকমের দেখাচ্ছে। বাড়ী মর্টগেজ দিয়েছেন। সুমিত্রারও কি পাত্র জুটে গেল?

গেল বিজয়া দশমীর দিনও সে প্রণাম করতে এসেছিল। চাঁপা রঙের সাড়ীতে অমন কালো মেয়েটাকেও দেখাচ্ছিল কত সুন্দর!

…চন্দনের টিপপরা সুমিত্রার কপালটা অলস হয়ে পড়ে রয়েছে তুমিনিট ধরে, সঞ্জয়ের পায়ের ওপর। বয়স্থা কুমারী মেয়ের যৌবন অভিমানে যেন মাথা খুঁড়ছে। সুমিত্রা ভালবেসে ফেলেছে।

পুরানো দিনের এ সব কাহিনী, ভাবতে ভালই লাগছিল। কিন্তু বৌদি এসে সামনে দাঁড়ালেন।—অভয় বাবুদের খবর শুনেছ ঠাকুরপো?

—না।

—সাবরেজিষ্টার নবীন বাবুর সঙ্গে সুমিত্রার……।

—বিয়ে, এই তো!

বৌদি হেসে চলে গেলেন। হাসিটা তিরস্কারের মতই। যাক্, সবচেয়ে বড় ভুলটাও ভেঙে গেল। এই একটা লাভ। ঐ চোখের জল, প্রণাম, লজ্জানত মুখ—কী ক্ষুরধার পবিত্র কোকেট্রি! সে চিনেও চেনে নি। এটা তারই অপরাধ।

সময় থাকতে সরে পড়া চাই। নইলে এই নীলামী মহলে তার সমস্ত মনুষ্যত্ব মেকী পণ্যে বিকিয়ে যাবে। এই ভগুহাস ভদ্র সংসারের ছলনাকে পেছনে রেখে চলে যেতে হবে। পশুর মত নিছক একটা গোত্রমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ইষ্ট এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। সঞ্জয় বুঝেছে, তার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন গোত্রান্তর। এই গৃহকূটের রহস্য সে ধরে ফেলেছে।

সঞ্জয় চলে যাচ্ছে দূরদেশে। রতনলাল সুগার মিলে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী। মাইনে কমবেশীর প্রশ্ন কিছু নেই। এই ত্রিশ টাকার চাকরীর মধ্যে সে দেখছে অজস্র মুক্তির প্রসাদ।

বিদায়ের দিন মকতপুরের এই জরাজীর্ণ বাড়ীটা যেন আর, একবার সমস্ত যাদুবল নিয়ে সঞ্জয়কে দমিয়ে দেবার মতলব করলো। ভাই-বোনেরা বাক্স বিছানা বেঁধে দিচ্ছে। পুতুল সকাল থেকে আঁচিলের মত গায়ে লেগে আছে—যেতে নাহি দিব গোছের ইচ্ছেটা। বাবার কথাগুলোর কটু ঝাঁজ উপে গেছে, সুস্থ ভাবে তামাক টানতে পারছেন না। মা রান্না ঘর থেকে এখনও বাইরে আসেন নি। উনুনের সামনে বসে যেন তাঁর বিগত অদাক্ষিণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। মাছের তরকারীই রাঁধলেন তিন রকমের।

বড়দা বিচলিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। বললেন—ভাল মনে যাও, আর মনে রেখ, উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেই। তুমিই একদিন ঐ মিলের মালিক হয়ে ব'সতে পার। স্যর রাজেন কি ছিলেন? সব সময় প্রসপেক্টের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

মোটর বাসে উঠে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সঞ্জয়।

একদিকে নির্জলা ফল্গু, আর তিনদিকে জঙ্গল। মাঝে চুরাশী পরগণা। জঙ্গলের ভেতর গ্রাণ্ডকর্ড লাইন নাড়ীর মত ধুকপুক করে। একটা রামখড়ির টিলার রেঞ্জ চলে গেছে কোডারমা স্টেশন পর্য্যন্ত।

মিল এলাকার নাম রতনগঞ্জ—একটা বাজার আর দূরে ও কাছে কুলি ও কর্ম্মচারীদের বাসা। চুরাশী পরগণার দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আলবাঁধা ঠাসা শাকসব্জী ও আখের ক্ষেত। ঠুঁটো ঠুঁটো কাকতাড়ুয়া মূর্ত্তি, শোর খেদাবার চালা, আঁকা বাঁকা নালা আর মাঝে মাঝে জল সেচবার বড় বড় কাঠের লাঠা, মাস্তুলের মত ভেসে আছে সবুজ সাগরে।

আখের ফসল পেকে ওঠে। দেড় মানুষের সমান লম্বা লম্বা ঋজু দাঁড়া, এক এক হাতের পাব। সবুজ রেশমী ফালির মত মাথাভরা পাতার নিশান। তুরী ছত্রি আর আহীরদের বস্তি—যাদের হাড়ের জলের সারে রত্নসম্ভবা হয়েছে চুরাশী পরগণার মাটী।

মিলের মালিক রায় বাহাদুর রতনলাল অতি সজ্জন লোক। একটা নগণ্য প্যানম্যানকেও আপনি বলে সম্বোধন করেন। প্রাতঃস্নানের আগে বাগানের যত পিঁপড়ের গর্ত্তে মুঠো মুঠো চিনি ছড়িয়ে আসেন।

ক্যাসমুন্সী সঞ্জয়। রায়বাহাদুর সঞ্জয়কে আশ্বাস দিলেন।—এই মিল তোমার। এর উন্নতি হলে তোমারও উন্নতি হবে। কাজ দেখাও, এখানে প্রসপেক্ট আছে।

কিন্তু মাসের পর মাস, চালান রসিদ রেজিষ্টার আর লেজার ঘষে, টাকা নোট আর রেজকি ঘেঁটে আঙুলের ডগা বিষিয়ে যায়। ক্রাশিং মেশিনের শব্দ, ছোবড়ার পাহাড় আর রাবগুড়ের গন্ধে প্রসপেক্টের টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না। সঞ্জয়ের মনেও ওরকম কোন ভুয়া আশার প্রগল্‌ভতা নেই। এই সব পয়োমুখ ধনকুম্ভদের রীতিনীতি তার ভালরকমই জানা আছে।

প্রসপেক্ট নয়, আরও বড় ও কঠোর এক সাধনার ভার নিয়ে সঞ্জয়

এসেছে এখানে। নিঃশেষে লোপ করতে হবে তার পুরাতন সত্তাকে, ফেরারী আসামীর মত।

অদ্ভুত চরিত্রের একটা লোক সঞ্জয়কে ভাবিয়ে তুলেছে খুব। ওর নাম নেমিয়ার। লোকটা কর্তৃপক্ষের চোখের বিষ। আজ পাঁচ বছর ধরে এখানে লোডিং মুহুরীর চাকরী করছে। ত্রিশ টাকায় আরম্ভ করে এখন এসে ঠেকেছে পনর টাকায়। লোকটার ছায়ার মধ্যে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ।

একে কুৎসিত, তার ওপর প্লুরিসি। সপ্তাহে তিন দিন টেবিলে পাঁজর চেপে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। দেখে মনে হয় লোকটা মেরুদণ্ডহীন, নইলে কেঁচোর মত অমন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকা যায় না।

তা ছাড়া আছে রুক্মিণী—নেমিয়ারের বোন। রতনলাল মিলের প্রবীন অর্ব্বাচীন সবাই সঞ্জয়কে সাবধান করে দিয়েছে—ঐ ভাইবোনের খপ্পর থেকে সামলে থেক বাঙালী বাবু।

নেমিয়ার গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এসে একদিন বলে গেল—এক নম্বরের কুঁয়োর জল ছাড়া অন্য জল খেয়োনা বাবুজী। ম্যালেরিয়া হবে।

আর একদিন কয়েক শিশি আইডিন, ক্যাস্টর অয়েল আর কুইনিনের বড়ি দিয়ে গেল।—তোমার জন্য নিয়ে এলাম কোডারমা হাসপাতাল থেকে।

সঞ্জয় শুধু অপেক্ষায় আছে, দেখা যাক এই নিষ্কাম প্রীতির পরিণাম কোথায় গিয়ে ঠেকে। তিন সপ্তাহের মধ্যে নেমিয়ারের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেল। অফিসে খাতা লিখছিল সঞ্জয়। মুখ তুলে তাকাতেই

দেখলো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে, ছোট ছোট চোখ দুটো মিট মিট করে জ্বল্‌ছে।

নেমিয়ার বললো—এইবার একটা বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে ফেল বাবুজী। দুজনে একসঙ্গে শিকার করা যাবে। রোজ খরগোসের রোষ্ট, দোয়াস্তা মহুয়ার সঙ্গে জমবে ভাল।

সঞ্জয়কে নিরুৎসাহ দেখে একবার কি ভেবে নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো—পাঁচটা টাকা লোন দাও তো বাবুজী। আসছে মাসে তা হলে তুমি পাবে ছটাকা আট আনা।

সঞ্জয় স্পষ্ট বলে দিল—হবে না, মাপ কর।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় হাসলো মনে মনে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির চরম পরিচয় সে জেনেছে। অত সহজে ভবী আর ভোলে না। নেমিয়ার কোন্ ছার।

কিন্তু নেমিয়ারকে চিনতে বোধহয় এখনো অনেক বাকী ছিল।

রাত্রিবেলা জোর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দরজার বাইরে কড়া নাড়ছে কেউ। সঞ্জয় দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো রুক্মিণী, হাতে খাবারের থালা।

—আজ নেমিয়ারের জন্মদিন। নেমিয়ার বলেছে আপনিই তার একমাত্র বন্ধু। তাই এই সামান্য কিছু খাবার নিয়ে এলাম আপনার জন্য।

কথা শেষ করে রুক্মিণী থালাটা নামিয়ে রেখে তক্তপোষের এক পাশে বসে পড়ে হেসে ফেললো।

সঞ্জয় এই প্রথম ভাল করে দেখলো রুক্মিণীকে। মেয়েটা কালো আর রোগা। বেশ বুদ্ধিভরা সেয়ানা দৃষ্টি। চোখের কোল দুটোতে

জাগরজ ক্লান্তির কালিমা। তবু দেখে বোঝা যায়, শুধু ভাল করে খেতে পেলে এই চেহারারই কী চমক খুলবে। বেশ দামী একটা সাড়ী প'রে এসেছে, বিলিতি সুগন্ধি মাখা। সবচেয়ে সুন্দর ওর দাঁতগুলো। কথা বলার সময় দেখায় দু'পাটি সারিবাঁধা ছোট ছোট শুক্লমণির মত। হেসে ফেল্লে মুক্তদল কুঁড়ির স্তবকের মত হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

সঞ্জয়ের তন্ময়তা দেখে রুক্মিণী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো—আপনি খেয়ে নিন। ততক্ষণ আমি বসছি।

খাওয়া শেষ হতেই রুক্মিণী উঠে ত্বরিৎ হস্তে এঁটো বাসনগুলি তুলে নিয়ে দাঁড়ালো—এবার চলি বাবুজী অনেক রাত হয়েছে।

সঞ্জয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—একা যাবে কী করে?

—তা যেতে পারবো। এক ঝলক হাসি হেসে রুক্মিণী বাইরে পা বাড়াতেই সঞ্জয় এঁটো হাতে খপ করে কব্জি চেপে ধরলো।

রুক্মিণী বললো—আঃ, বাসনগুলো পড়ে গেল বলে! আগে নামিয়ে রাখতে দাও।

কদিন পরে নেমিয়ার অফিসে সঞ্জয়ের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর চোখ দুটো আবার মিট মিট করে জ্বলছে। গলার স্বর নামিয়ে বললো—তুমি রুক্মিণীকে ভালবাস? প্রশ্নের আঘাতে সঞ্জয় চমকে উঠতেই নেমিয়ার বললো—সে তো সুখের কথা। লজ্জা পাবার কি আছে? আচ্ছা, আমি চলি এবার। দাও।

সঞ্জয়—কি?

—সেই যে পাঁচটা টাকা দেবে বলেছিলে!

থ্যাঙ্ক ইউ! নোটটা পকেটে গুঁজে নেমিয়ার বললো—যখন যা দরকার হবে আমায় বলো।

সত্যিকারের গোত্রান্তর হয়েছে সঞ্জয়ের। পাখী শুধু তার ডাকার আবেগে যেমন করে সঙ্গিনী লাভ করে, রুক্মিণী তেমনি ভাবে এসেছে তার কাছে। তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে এই পথের মেয়েটাই সসম্মানে লুফে নিয়েছে। এ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভাল। তার বিদ্রোহের প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে।

বাড়ীর চিঠি আসে। খাঁটি বাঙালী বাড়ীর চিঠি—কেমন আছ? উন্নতি কতদূর হলো? সংসারে বড় টানাটানি। কিছু পাঠাতে পারলে ভাল হয়।

চিঠি আসে কিন্তু উত্তর যায় না। মধ্যে অনেক দূর ব্যবধান—বালুচর আর চোরাবালি। চিঠিগুলি খবরের কাগজের টুকরোর মত মনে হয়। ও দুঃখ তো আর একা মকতপুরের দত্তবাড়ীর নয়। এই নেমিয়ারের বৌ তিনটী ছেলে কোলে ক'রে কুঁয়োয় ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই খবরের কাটিং আছে নেমিয়ারের বুকপকেটে। পৃথিবীর দুঃখ মিটলে দত্তবাড়ীরও দুঃখ মিটবে।

রাত্রে হাঁড়িয়া খেয়ে এক এক দিন কড়া নেশায় মাথায় জ্বালা ধরে। সঞ্জয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। রুক্মিণী অনুনয় করে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কাঁদ কেন?

চিঠিগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেয় সঞ্জয়, ক্ষ্যাপা বামুন যেমন করে তার উপবীত ভস্ম করে।

চুরাশী পরগণা থেকে সহস্র যোজন দূরে, লবণ পারাবারের অপর প্রান্তে ওলন্দাজের দেশে মুদ্রালক্ষ্মী বিধবা হয়েছে। স্বর্ণমান বাতিল হয়ে বাট্টা আর বিনিময়ের হার পাল্টে গেছে রাতারাতি। গিলডারের দাম এক দফায় নেমে গেছে সস্তা হয়ে।

সেই ক্ষুব্ধ বাণিজ্য বায়ু হুহু করে আকাশে পাড়ি দিয়ে এসে ঠেকেছে কলকাতার বন্দরে। টন টন জাভা চিনি নামছে অতি মন্দ দরে। ইণ্ডিয়ান চেম্বারে বিষাদ। মতিপুর, চম্পারণ আর কানপুর স্পেশাল বস্তাবন্দী হয়ে কাঁদছে আড়তে আড়তে।

ওলন্দাজের বাজারের অভিশাপ এসে লাগলো রতনলাল মিলে আর চুরাশী পরগণার আখের ক্ষেতে। মিলের ঘরে ঘরে মুনিবজী নোটিশ পড়ে গেলেন—মাইনে ও মজুরী শতকরা চল্লিশ কাট্।

কিষাণেরা ফটকে ভীড় করেছে। চোঙ মুখে দিয়ে মুনিবজী আখের দর ঘোষণা করে দিলেন—এগার পয়সা মণ। যে যে বেচতে রাজী আছ কাল থেকে ফসল পৌছাও!

সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মিল ফটকে কর্ম্মচারী ও কিষাণদের জনতা নিঝুম হয়ে বসে রইল। রায়বাহাত্বরের ছেলে স্বর্য্যবাবু চলে গেছেন কোডারমা। ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কলকাতার বাজারের অবস্থা জানতে।

ভীড় সরাতে রায়বাহাত্বর স্বয়ং হাতযোড় করে এসে দাঁড়ালেন।—বাবালোগ, বৃথা ঝামেলা কেন? এ সব নসীবের মার। ভগবানের কাছে মানাও, যেন স্থদিন ফিরে আসে।

কিষাণদের মধ্যে মুনিরাম একটু জবরদস্ত। সাফ জবাব দেবার মত জিভ ওর আছে। মুনিরাম বললো—সরকারী রেট তো পৌনে পাঁচ আনা বাঁধা আছে হুজুর।

রায়বাহাত্বর স্মিতহাস্যে বললেন—ওসব স্থখস্বপ্ন ছাড়ো ভাইয়া। সে রামরাজ নেই। জাভা মাল এসে ডাকাতি করছে। তমাম আগুন লেগে গেছে। মিল বন্ধ না করে দিতে হয়।

মুনিরামও ছাড়বার পাত্র নয়।—কাল সকালে ঘরের ছেলে-মেয়েগুলিকে সব পাঠিয়ে দেব। মেহেরবানি করে গুলি চালিয়ে শেষ করে দেবেন। সেই বরং ভাল।

সস্নেহে ভৎর্সনা করে রায়বাহাদুর বল্লেন—বেকুব ঘোড়া কাঁহাকা। যা যা ঘরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর্। এ শঙ্কর পালোয়ান, ফটক বন্ধ করো।

পরাজিত পল্টনের মত জনতা ফটক থেকে সরে এল। কর্ম্মচারী আর মজুরেরা যে যার ঘরের পথ ধরলো। শুধু সঞ্জয় চললো অন্যদিকে। সঙ্গে নেমিয়ার মুনিরাম সুখলাল ছেদি, আরও কজন কিষাণ। বুড়ো বটের তলায় পুরানো শিবালয়ের সিঁড়িতে ওরা নিঃশব্দেই এসে বসলো।

সঞ্জয় বললো—এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

মুনিরামের অন্তরাত্মা যেন এই বরাভয়বাণীর জন্য ওৎ পেতে বসে ছিল। লাফিয়ে উঠে বললো—দোহাই বাঙালী বাবু। একটা উপায় বলে দাও।

কটা গবেট গোছের কিষাণ কি জানি কিসের প্রেরণায় ডাক ছাড়লো—হর হর মহাদেও!

নেমিয়ার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিস্তি করে ধমক দিল—এই খবরদার! কোন আওয়াজ নয়।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর সঞ্জয় প্রস্তাব করলো—কেউ ফসল বেচবে না।

সবাই বললো—ঠিক বাত।

—তোমরা দর নামিও না। ওরা শেষে কিনতে বাধ্য হবে। নতুন নতুন মেশিন এসেছে, কাজ ওদের চালু করতেই হবে।

সুখলাল বললো—যদি না কেনে!

মীমাংসা হয়েই যাচ্ছিল, সুখলালের প্রশ্নে আবার বিতণ্ডা সুরু হল। সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বললো—কিনতে বাধ্য হবে। লড়াই সুরু করে দাও। বট পাতা ছুঁয়ে সকলে কসম খাও।

সঞ্জয়ের কথার মধ্যে অদ্ভুত এক আশ্বাসের উদ্দীপনা ছিল। সকলের প্রতিজ্ঞা আর উৎসাহের ঝড়ে যেটুকু সংশয়ের মেঘ ছিল, তাও কেটে

গেল। পুণ্য বাতাসে শিবালয়ের ঐ নিরেট বধির বিগ্রহটা সত্যিই যেন জেগে উঠলো এতদিনে।

বৈঠক শেষ হলো।

রুক্মিণীর ঘরের কাছাকাছি এসে সঞ্জয় বললো—নেমিয়ার, তুমি এইবার যাও। আজ থেকেই লেগে যাও। খুব ভাল করে অর্গ্যানাইজ কর।

—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এম-এ পাশ সঞ্জয় ক্যাশ মুন্সী হয়ে গেছে। তার অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোষে ফণা নামিয়ে দিন গুনছিল। এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পারা যায়।

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত ভাবনাকে সংগ্রামের সাজে সাজিয়ে তৈরী হলো সঞ্জয়। রতনলাল মিলের চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়। ডাইনোসরের মত ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে চুরাশী পরগণার বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেতের দিকে। ঐ দানবীয় চর্ব্বির স্তূপের ভেতর কোথায় হৃদ্‌পিণ্ড লুকিয়ে আছে তা সঞ্জয়ের অজানা নয়, ঠিক সেইখানে তাক্ করে আঘাত দিতে হবে।

মন ভরা উল্লাস নিয়ে সঞ্জয় রুক্মিণীর ঘরে ঢুকলো।

আদরের বাড়াবাড়ি দেখে রুক্মিণী প্রশ্ন করে বসলো—বড় সস্তার সওদা পেয়েছ না? তবুও একদিন তো ছেড়েই দেবে।

—সস্তা? আমার আর কি দেবার বাকী আছে? আর ছেড়েই বা দেব কেন?

রুক্মিণী যেন একটু অনুতপ্ত হয়েই হাত দিয়ে সঞ্জয়ের মুখ চেপে

ধরে বললো—আচ্ছা! আচ্ছা। মাপ করো। আর বলবো না। তবে তুমি নিজেই সেদিন নেশার ঘোরে বলছিলে, আমি নাকি সরবতের গেলাস, সরবত নই।

সঞ্জয়ের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই রুক্মিণী বললো—আমার কিছু থোক টাকা চাই। একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে।

রুক্মিণী গায়ের আঁচলটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।—বুঝেছ? আমার চলবে কি করে?

—হাঁ বুঝেছি। সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে গেল।

রতনলাল মিলের সমস্ত মেশিন বন্ধ। অতিকষ্টে দু'চার গাড়ী মাল যোগাড় হয়েছে। কলকাতার মার্কেটের অর্ডার মেটাবার শেষ দিন এগিয়ে আসছে। রায় বাহাদুর পাগল হয়ে সদরে এস-ডি-ও'র বাংলোতে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

চুরাশী পরগণার ফসল শুকোচ্ছে মাঠে মাঠে। এজেন্টরা গাড়ী আর টাকার তোড়া নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে! মাল ছাড়বে তো ছাড়। পাতা লাল হয়েছে কি এক আনাও দর দেব না। কিষাণরা হেসে চুপ করে থাকে।

নেমিয়ার একেবারে উধাও হয়েছে। বাড়ীতে থাকে না, আফিসেও আসে না। দাঁড়কাকের মত সে দিনরাত চুরাশী পরগণার মাঠে ঘাটে বস্তিতে উড়ে বেড়াচ্ছে।—খবরদার, এজেন্টদের কথায় কেউ ঘাবড়িয়ো না। রতনলাল মিল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

চুরাশী পরগণার ওপর শকুন উড়ছে কদিন থেকে। গো-মড়ক লেগেছে। মুনিরামের একটা ছেলেও মারা গেছে বসন্তে।

সাহুরা খেরোবাঁধা খাতা আর তমস্থকের নথি নিয়ে দরজায় দরজায় হানা দিচ্ছে তাগাদায়। একটা রিক্রুটার ত্রিশ জন তুরীকে গেঁথে নিয়ে সরে পড়েছে মালয় রবার বাগানের জন্য। কদম সাগরের রাস্তায় গরুর গাড়ী লুট হয়েছে। মিলিটারী পুলিশ রুট মার্চ করে গেছে।

পঙ্গপালের মত কোডারমার গয়লারা এসেছে দলে দলে। মোষ কিনছে পাঁচ টাকায়, দুধেল গরু আট টাকায়, বাছুর বার আনা। সাহুরা চড়া স্থদে রূপোর গয়না বন্ধক নিচ্ছে, পেতল কাঁসার বাসন বিলিয়ে যাচ্ছে মাটীর দরে।

চুরাশী পরগণার ঘরে ঘরে সেদ্ধ হচ্ছে কোনার গাছের পাতা। ঘরে ঘরে দানা আনাজ নিঃশেষ।

এক মাস হতে চললো। রায় বাহাদুর এজেন্টদের গালাগালি দিয়েছেন। যেমন করে পার মাল নিয়ে এস। মার্কেটে আর ইজ্জৎ থাকে না। মেশিনে মর্চে পড়ে গেল।

এস-ডি-ও এসে মিল দেখে গেছেন। পেয়াদা দিয়ে চুরাশী পরগণায় ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন।—সব কোই হুঁসিয়ার হো যাও। ফসল ছাড়, একদিন মাত্র সময় দেওয়া গেল। নইলে কাল থেকেই নয়াবাদ পরগণা থেকে ফসল আনা হবে।

মুনিরাম আর স্থখলাল এল সন্ধ্যেবেলা। ঘেয়ো কুকুরের মত চেহারা। এখনও ভরসা জল্ জল্ করছে ওদের চোখে, হাত পেতে হুকুম চাইছে।—বাবুজী এইবার কি করতে হবে হুকুম দাও।

সঞ্জয় বললো—আর কটা দিন সবুর কর।

মুনিরাম আর স্থখলাল চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। কিছু একটা বলবার হয় তো ছিল। বলা আর হলো না।

ঘটনাগুলি কেমন ঘোরাল হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর এখনও তাকে ডাকলো না, এই সঙ্কটে একটা পরামর্শের জন্য। আভাযে সঞ্জয়

একদিন জানিয়েও ছিল—যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শান্ত করি।

এদিকে রুক্মিণী আবার এক কাঁটা গিলে বসে আছে। তুদিকেই একটা ব্যবস্থা এবার করা উচিত। কিন্তু নেমিয়ার ছাড়া কি করে কাজ হয়। কাজের বেলা লোকটা সত্যিই বড় সহায়!

নেমিয়ার এসে সামনে দাঁড়ালো।

কেরোসিনের বাতির ময়লা আলো। নোংরা খাকি প্যাণ্ট, ছেঁড়া কামিজ, পাখীর বাসার মত রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা। কেঁচো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে আছে—লোহার মূর্তির মত ঋজু ও কঠিন। গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁৎকে উঠেছে, ব'সে আছে মাথা নীচু করে।

নেমিয়ার চাইতে এসেছে মিলের ক্যাশঘরের চাবি।—গিরগিটির মত চেটে নিয়ে আসবো যা কিছু ক্যাশ আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। ফাইল রেজিষ্টার ছাই হয়ে যাবে! তোমাকে দায়ী করবে কি দিয়ে? কে বলবে কত ব্যালান্স ছিল? দাও চাবি দাও।

সঞ্জয় ঘাড়টা একবার তুলে তাকালো বাইরের অন্ধকারের দিকে। আলোটা একটু উজ্জ্বল থাকলে দেখা যেত, দম্‌কা শিহরে তার হাঁটু তুটো কবার থর থর করে উঠলো।

নেমিয়ার যেন ভয়ঙ্কর অর্থহীন এক ব্যালাড গাইছে।—চুরাশী পরগণার রসদ চাই। তারপর দেখবো, লয়াবাদের সড়ক দিয়ে কোন মরদকা বাচ্চা বাইরের মাল আনতে পারে। কেউ বেচবে না ফসল, ক্ষেতে ক্ষেতে শুকিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। কিষাণেরা সব কসম খেয়েছে। আজ রাত্রে লাঠি মাজা হচ্ছে ঘরে ঘরে। সব তো গেছে, কিন্তু রতনলাল মিলকে দেখে নেবে তারা। মাথা দেবে, মাথা নেবে।

বসন্ত খোদা মুখ, গোল গোল চোখ, বেঁটে রোগা ঘুঁটে রঙের চেহারা নেমিয়ার, যাকে চড়ুই পাখীও ভয় পায় না। সেই এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়ের সুমুখে, অতি আসন্ন এক বিপ্লবের ফরমান হাতে নিয়ে।

নেতিয়ে পড়ছে সঞ্জয়। নেমিয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—অত ভাবনা কিসের কামরেড দাদা! তোমার কিষাণ ফৌজকে খেতে হবে তো। দাও, আর দেরী করো না।

ক্যাশঘরের চাবির তোড়া নিয়ে নেমিয়ার অন্ধকারে পিছলে সরে পড়লো।

উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ পায়চারী করে সঞ্জয় এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেতে। একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতে পারে নি। সার্কাস দেখাবার জন্য যে সিংহকে খাঁচার বাইরে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিতেই সেটা এমন বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে, কে এতটা ভেবেছিল?

—নেমিয়ার। অন্ধকারে সঞ্জয়ের ভাঙা গলা কেঁপে উঠলো।

দৌড় দিল সঞ্জয়।

রুক্মিণীর ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর সঙ্গে তারযন্ত্রের বিলাপের মত একটা স্বর ঠিকরে এসে পড়ছে। সঞ্জয় দম বন্ধ করে জানালার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঝের ওপর লুটোচ্ছে রুক্মিণী। সাড়ীর ভার খসে গিয়ে কোমরে শুধু গেরোটা লেগে আছে। খোঁপাটা মাটীতে ঘসা খেয়ে নোংরা হয়ে গেছে। কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক। লাঠি-খাওয়া সাপের মত পাকিয়ে পাকিয়ে কাতরাচ্ছে রুক্মিণী।

রুক্মিণীর প্রাণবায়ু যেন করাল ঝঞ্ঝার মত সমস্ত শরীরে একবার গুমরে উঠলো। এমন অবস্থায় অনেকে তো মারা যায়। রুক্মিণীর কপালেও কি তাই আছে !

অনাবৃত মসৃণ হাঁটুর ওপর অতি পরিচিত সেই নীল শিরার আঁকা বাঁকা রেখাগুলি, জোঁকের মত ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের ওপর দাঁতের পাটি চেপে বসে গেছে। চোখের কোণ থেকে তোড়ে তোড়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কান ভাসিয়ে। চাপা আর্ত্তস্বর পর্দ্দায় পর্দ্দায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। ফুসফুসটা ফেটে যায় বুঝি। এই কি মৃত্যু !

কী নিষ্ঠুর বিভ্রম! সমস্ত যন্ত্রণা ধন্য করে কপট মৃত্যুর আড়ালে এক নবজীবনের রক্তবীজ পৃথিবীর মাটিতে হাত বাড়িয়েছে। সঞ্জয় এক লাফে পিছিয়ে এসে গাছের নীচে দাঁড়ালো।

নেমিয়ার কোথায়? সঞ্জয় এগিয়ে নেমিয়ারের ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দিল।

কালো প্যাণ্ট পরে, কোমরে একটা চওড়া বেল্ট ক'সে নেমিয়ার বসে বসে চিবোচ্ছে বাসি রুটি। হাঁড়ি থেকে ঢেলে পচাই খাচ্চে এক এক চুমুক। একটা ধারালো ভোজালী সামনে রাখা। মুখে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা ; শুকনো ঠোঁট দু'টো নেকড়ের মত হাসছে।

এ-ঘরে ভাই, ও-ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্ব্বর পৃথিবীর দুজন কুপিত ডাইন ও ডাইনী যেন তুক্ করে সর্ব্বনাশের আহ্বান করছে !

নদীতে বান ডাকে, ভয়াল জলের তোড় আসে গর্জ্জন করে। জেলে তার যথাসর্ব্বস্ব ঘাড়ে তুলে দৌড় দেয়। সঞ্জয় দৌড়ল।

সড়ক না ধরে, মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত্ত ডিঙিয়ে সঞ্জয় দৌড়ে চলেছে। মিল ফটকের আলোটা ঘোলাটে আলেয়ার মত কুয়াশায় দপ দপ করছে। আর বেশী দূর নয়।

মকতপুরই বা কতদূর। আজ শেষ রাত্রে ট্রেণ ধরলে কাল

বিকালেই পৌঁছে যাবে। শিরীষ গাছে হয়তো ঝুঁটি পেকেছে। সোনালী বৈকালে হাল্‌কা বাতাসে বাজে মোটা ঘুঙুরের বোলের মত। বড়দা বারান্দায় বসে গুড়ের তৈরী চা খান। মা উঠোনে বসে লক্ষ্মীর পিঁড়ি ধুতে থাকেন। পুতুল আকাশে আঙুল তুলে শঙ্খচিলের ঝাঁক গোণে—এক দুই তিন। সুমিত্রা। হয়তো তার বিয়ে হয় নি। তার শবরীদৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় মকতপুরের বাড়ীর জানালায়—পথে—ধাবমান মোটর বাসের দিকে।

রায়বাহাদুর রতনলাল, সূর্য্যবাবু, মুনিবজী। সামনে টুলের ওপর বসে আছে সঞ্জয়—বিশীর্ণ রোগীর মত। ভাঙা কাঁসরের মত গলার আওয়াজ। এক গেলাস গরম দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে।

রায়বাহাদুর ডাকলেন—শঙ্কর পালোয়ান, ক্যাশঘরে পাহারা বসাও। নেমিয়ার বাবুজীকে ছুরি দেখিয়ে চাবি নিয়ে গেছে। আজ রাত্রেই চুরি করতে আসবে। চোট্টা শালাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলতে হবে। বন্দোবস্ত কর।

মুনিবজীকে হুকুম দিলেন—বাবুজী স্টেশনে যাবেন। এখনি একটা ভাল ঘোড়ায় গদি চড়িয়ে দাও। আর আমার সিন্দুক খোল, বকশিস দিতে হবে। বড় ইমানদার ছেলে!

আদাব জানিয়ে সঞ্জয় উঠলো। রায়বাহাদুর বললেন—কটা দিন বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর। তারপর এস আমার গোরখপুর মিলে—শও রূপেয়া তন্‌খা।

রামখড়ির রেঞ্জের গায়ে গায়ে সরু জংলী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সঞ্জয়। আকাশের বুকটা লাল হয়ে গেছে। কিষাণেরা আগুন

জ্বালিয়ে দিয়েছে নিজের নিজের ক্ষেতে। পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে চুরাশী পরগণা।

সামনের মাঠটা পার হলেই স্টেশন, ডিস্টাণ্ট সিগনালের আলোটা নীল তারার মত ভেসে রয়েছে। ছপ্ করে একটা শব্দ। ঘোড়াটা একটা স্রোতে পা দিয়েছে।

সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুর্গী চুরি করে খেয়ে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও এসে জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।

শেষ—